ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

এপ্রিল ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

শ্রমিক-কল্যাণ

ভারতে শ্রম চিত্র : কয়েকটি জটিল ইস্যু
প্রবীণ ঝা

ভারতে শ্রম সংস্কার
শ্রীরঙ্গ ঝা

ভারতে অসংগঠিত শ্রম বাজার
এ. শ্রীজা

শ্রম নীতি ও শ্রমিক-কল্যাণ : আন্তর্জাতিক চিত্রের সঙ্গে তুলনা
প্রদীপ আগরওয়াল

বিশেষ নিবন্ধ
মহিলাদের কর্মনিযুক্তি : আশাই ভরসা
নীতা এন.

ফোকাস
শিশুশ্রম আইন সংস্কার ও শিশুশ্রম বিলোপ
হেলেন আর. সেকার

স্বচ্ছ ভারত মিশন : মহিলাদের ভূমিকার স্বীকৃতি

'স্বচ্ছ শক্তি শপথ'। ২০১৭-র পয়লা মার্চ গোটা দেশ জুড়ে সপ্তাহব্যাপী বিবিধ কর্মকাণ্ডের এই সমন্বিত কর্মসূচির সূচনা করে পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক। স্বচ্ছ ভারত মিশনে মহিলাদের ভূমিকাকে তুলে ধরা তথা এই কর্মকাণ্ডে তাদের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দানের জন্যই এই আয়োজন। এই কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য। প্রথমত, নিজেদের গ্রামগুলিকে "উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস মুক্ত" এলাকা হিসাবে পরিণত করতে যেসব মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান এবং স্বচ্ছতা অভিযানের সঙ্গে জড়িত তৃণমূল স্তরের 'স্বচ্ছগ্রহী' মহিলা প্রতিনিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তাদের সম্মান জ্ঞাপন। দ্বিতীয়ত, মহিলাদের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত থেকে স্বাস্থ্যবিধান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, 'স্কিল ইন্ডিয়া', 'ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া', আবাস যোজনা এবং 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত। তৃতীয়ত, গুজরাতে (ক) ডেয়ারি উন্নয়ন, (খ) জল সংরক্ষণ (WASMO মডেল ও ফোঁটায় ফোঁটায় সেচ পদ্ধতি), (গ) স্ব-সাহায্য গোষ্ঠী, (ঘ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, (ঙ) ই-গ্রাম/ডিজিট্যাল গ্রাম, (চ) খাদি এবং (ছ) কৃষি পণ্য বাজারের মতো বিবিধ বিকাশ কর্মোদ্যোগে মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের গুরুত্ব নিরূপণ। এছাড়াও অনুষ্ঠানের অন্যান্য লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল : (১) স্বচ্ছ ভারত মিশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্তরের অংশগ্রহণকারী এবং সম্মানীয় প্রতিনিধিদের তাদের দায়িত্বকে একবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। (২) স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্ম-পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ও মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তন আনা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সক্ষমতা গড়ে তোলার কাজটা সহজতর করা। (৩) যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত ইতোমধ্যেই "উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস মুক্ত" এলাকার মর্যাদা পেয়ে গেছে, পরবর্তী কালেও তারা যাতে সেই অবস্থান ধরে রাখে সে জন্য তাদের উৎসাহ-সহায়তা দেওয়া। (৪) শৌচাগার তৈরি/ব্যবহারের নিক্তিতে যেসব জেলা পেছনের সারিতে রয়ে গেছে সেখানে অন্যত্র কাজে এসেছে এমন সফল আইডিয়া প্রয়োগ তথা নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত মানুষ খুঁজে বের করা। (৫) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পরস্পরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য রাজ্য স্তরেও অনুরূপ অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করা।

'স্বচ্ছ শক্তি শপথ'-এর জাতীয় স্তরে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় হরিয়ানার গুরুগ্রামে। হরিয়ানা সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে। সে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল স্তরের হাজারেরও বেশি মহিলা "স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ন" এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মহিলা "স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ন", মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান, আশা (ASHA) কর্মী, স্কুল শিক্ষক, কমবয়সী ছাত্র-ছাত্রী, বয়স্ক নাগরিকদের সম্মান জানাতে গোটা দেশজুড়ে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার মধ্যে গুজরাতে অনুষ্ঠিত "স্বচ্ছ শক্তি ২০১৭" নামক অনুষ্ঠানটি ছিল ধারে-ভারে সব থেকে বড়ো মাপের বা মেগা-ইভেন্ট। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের "উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস মুক্ত" গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আগত ৬০০ মহিলা স্বচ্ছগ্রহী পঞ্চায়েত প্রধানের উদ্দেশে ভাষণ দেন। স্বচ্ছ ভারত গঠনে অবদান রাখায় তাদের সম্মান জ্ঞাপন করেন। গান্ধীনগরে 'স্বচ্ছ শক্তি ২০১৭'-র জমায়েতের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, আগামী ২০১৯ সালটি হল মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী, যিনি কি না পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে এমন কি রাজনৈতিক স্বাধীনতার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার তাগিদ এখন যে লক্ষণীয় মাত্রায় চোখে পড়ছে তাকে ধরে রাখতে জমায়েতের উদ্দেশে আর্জি রাখেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আমরা যখন পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করব এবং নোংরা আবর্জনাকে নির্মূল করতে পারব তার মাধ্যমে সব থেকে বেশি লাভবান হবেন গরিব মানুষজন। তিনি জোরের সঙ্গে আরও বলেন, যারা এক গুণগত পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন সেই সব মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের সাথে সাক্ষাতের পর প্রত্যক্ষ করেছেন সদর্থক পার্থক্য গড়তে এরা কতখানি দৃঢ়চিত্ত। "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও" কর্মোদ্যোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান বিশিষ্ট গ্রামগুলি কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনায় ইতি টানতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

গোটা দেশের ১ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রাম এবং ১১৮-টি জেলাকে ইতোমধ্যে "উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস মুক্ত" বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সারা দেশেই মহিলারা তৃণমূল স্তরে স্বচ্ছ ভারত গঠনে চ্যাম্পিয়ন বলে প্রমাণিত হয়েছেন তথা এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।❑

এপ্রিল, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

● এই সংখ্যায় ৩

● এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

● ভারতে শ্রম চিত্র : কয়েকটি জটিল ইস্যু — প্রবীণ ঝা — ৫

● ভারতে শ্রম সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা — শ্রীরঙ্গ ঝা — ৮

● ভারতে অসংগঠিত শ্রম বাজার — এ. শ্রীজা — ১২

● শ্রম নীতি ও শ্রমিক-কল্যাণ : আন্তর্জাতিক চিত্রের সঙ্গে তুলনা — প্রদীপ আগরওয়াল — ১৭

বিশেষ নিবন্ধ

● মহিলাদের কর্মনিযুক্তি : আশাই ভরসা — নীতা এন. — ২২

ফোকাস

● শিশুশ্রম আইন সংস্কার ও শিশুশ্রম বিলোপ — হেলেন আর. সেকার — ২৮

নিয়মিত বিভাগ

● যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল — ৩১

● যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৩২

● জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা — ৩৫

● উন্নয়নের রূপরেখা — —ওই— — ৩৭

● যোজনা ডায়েরি — সংকলক : রমা মণ্ডল — ৩৮

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

মর্যাদার সঙ্গে শ্রম

যে কোনও দেশের বৃদ্ধি এবং বিকাশের সংজ্ঞা দিতে সক্ষম সে দেশের শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত জনশক্তি। যে কোনও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-কল্যাণ দেশের মজবুত অর্থনীতির এক পূর্বশর্ত। কিন্তু শ্রমিকদের কর্মস্থলে সুস্থ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের ভালো থাকা তথা স্বচ্ছল জীবনযাপন সুনিশ্চিত করাটা দেশের নীতি প্রণেতাদের কাছে এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় শ্রমের বাজার, সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র; এই দুই ভাগে সুস্পষ্টভাবে বিভাজিত। সংগঠিত শ্রমিকদের অংশভাক এর মধ্যে সামান্যই। তা সত্ত্বেও কঠোর আইন-কানুন এবং নিয়ম-নীতির দৌলতে এরা নিজেদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। নিজেদের অধিকার রক্ষায় লড়াই চালানোর মতো জায়গাটা এদের করায়ত্ত। এ দেশে শ্রমিক শ্রেণির সিংহভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। যাদের না আছে কাজের নিশ্চয়তা, না আছে কোনও সামাজিক নিরাপত্তা। বিভিন্ন শ্রমিক গোষ্ঠী, তা তারা সংগঠিত বা অসংগঠিত, শিল্প বা কৃষি, দেশান্তরী বা স্থানীয় যে শ্রেণির আওতাভুক্তই হোক না কেন, প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ইস্যু এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। শহরাঞ্চলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণি নিত্যদিন কঠোর পরিশ্রম করে চলে, যার দৌলতে বিত্তশালীদের বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন ও সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলের অসংগঠিত শ্রমিকেরা সামান্য মজুরি বা বেতনে ভূস্বামী বা জমি মালিকদের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে চলেন। 'অসংগঠিত' এই শব্দটিই তাদের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার প্রতীক চিহ্ন বিশেষ; যার মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে নিম্ন হারের মজুরি, কর্মস্থলে কাজের অবর্ণনীয় খারাপ পরিবেশ, তথা কর্মসংস্থানের সুযোগের অনিশ্চয়তার মতো বৈশিষ্ট্য। দেশান্তরী শ্রমিকরা তাদের পরিবার-সহ শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পোটলা-পুঁটলি নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ান কাজের খোঁজে। নির্মাণ কর্মী, সড়ক নির্মাণ শ্রমিক, গৃহস্থালি কর্মে সাহায্যকারী এমন বহু রূপে তারা আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছেন। এছাড়াও মহিলা শ্রমিকরা হলেন শ্রমশক্তির সেই বিশেষ শ্রেণি যাদের সিংহভাগের কাজই খুব কম সময়ই নজরে আনা হয় বা তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি মেলে।

যোজনা

আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বের বৃহত্তম শ্রমশক্তির দেশ হয়ে উঠতে চলেছে ভারত। এই বিষটিকে মাথায় রেখে শ্রমিক সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া ও শ্রমিকদের প্রাপ্য গুরুত্ব অর্পণ করাটা নিতান্তই জরুরি। শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে শিল্প-সংক্রান্ত বিবাদ আইন, ন্যূনতম মজুরি আইন, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আইন-এর মতো এক গুচ্ছ আইন বহু বছর আগেই লাগু করা হয়েছে। সাম্প্রতিকতম উদ্যোগগুলি হল "পেমেন্ট অব বোনাস (সংশোধন) বিল, ২০১৫"; "কর্মচারী ক্ষতিপূরণ (সংশোধন) বিল, ২০১৬"; "শিশু শ্রমিক (নিষেধ ও প্রবিধান) সংশোধন বিল, ২০১৬। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক বর্তমানে পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় শ্রম আইনগুলির সরলীকরণ, সংযোজন এবং যুক্তিসঙ্গত ধাঁচে সংশোধনের মাধ্যমে এগুলির জায়গায় চারটি শ্রম সংহিতা (Labour Code) প্রণয়ন ও লাগু করার প্রতি। এগুলি হল : মজুরি বিল ২০১৫ সংক্রান্ত শ্রম সংহিতা; শিল্প সম্পর্ক বিল ২০১৫ সংক্রান্ত শ্রম সংহিতা; সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত শ্রম সংহিতা; এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মস্থলের পরিবেশ সংক্রান্ত শ্রম সংহিতা। বর্তমান এবং ভাবীকালের শ্রমশক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে তথা তারা যাতে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যপূরণে স্বয়ং-সক্ষম হয়ে ওঠে তার জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন, অটল পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনা ইত্যাদি কর্মসূচি/প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

বিশ্বে বৃহত্তম পুঁজি বিনিয়োগ গন্তব্য এবং ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসাবে ভারতকে গড়ে তুলতে সরকার দৃঢ় নিশ্চিত। এই দায়বদ্ধতার খাতিরেই দেশে শ্রম সংস্কারের প্রতি নজর দেওয়ার মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার পেছনে উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে তার মানের এক সমতা বিধান এবং সার্থক অর্থে শ্রমিকদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা।❑

ভারতে শ্রম চিত্র : কয়েকটি জটিল ইস্যু

*সবাই মোটামুটি একমত যে, কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সেই সঙ্গে তার গুণমান ভারত-সহ গোটা বিশ্বের অর্থনীতির সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং গত কয়েক বছরে তা আরও জোরালো রূপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের ২০১৬-র প্রতিবেদনেও মেলে এর সমর্থন। এই রিপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, নিচু মানের কর্মসংস্থান বিশ্বজোড়া এক গুরুতর সমস্যা রূপে বহাল থেকে গেছে। অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন কর্মসংস্থান কমছে আরও শম্বুক গতিতে। বিশ্ব সংকট শুরুর আগে বরং তা কমছিল তুলনায় কিছুটা দ্রুত গতিতে। ছুটকোছাটকা কাজে দিন গুজরান করছে ১৫০ কোটি মানুষ, অর্থাৎ কর্মীকুলের ৪৬ শতাংশের বেশি। এহেন কাজের না আছে স্থায়িত্ব, না আছে নিরাপত্তা। মজুরি মেলে যৎসামান্য। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকায় সাহারা-লাগোয়া দেশগুলির হাল আরও সঙ্গিন। এসব জায়গায় ৭০ শতাংশের বেশি কর্মীর এ ধরনের কাজে লেগে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১] আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের ওই রিপোর্ট অনুসারে, আগামী ২ বছরে বিশ্বে কর্মী বাহিনীর তালিকায় ঢুকবে আরও ২৪ লক্ষ বেকার যুবা। এর মধ্যে এক ভারতেই ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার। যা কিনা, দক্ষিণ এশিয়ার মোট বেকারের প্রায় ৬০ শতাংশ।[২] স্বাধীনতা ইস্তক তাই কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও ভদ্রগোছের মজুরির সংস্থানের জন্য নীতি প্রণয়ন এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানীংকার ভারতে সার্বিক শ্রম চিত্র সংক্রান্ত কতিপয় জটিল ইস্যু এই ছোট্ট নিবন্ধে তুলে ধরেছেন—***প্রবীণ ঝা***

এই সন্ধিক্ষণে কর্মীদের অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ

ভারতের ১৩০ কোটির মতো লোকের (বিশ্বে প্রতি ৬ জন মানুষের মধ্যে ১ জন ভারতীয়) মধ্যে ৭০ শতাংশ থাকে গ্রামে এবং ৪০-৪৫ শতাংশকে কর্মীর শ্রেণিতে ফেলা যায়। এই অনুপাত বা তথাকথিত কর্মী জনসংখ্যার অনুপাত স্বাধীনতার সময় থেকে আজ অবধি মোটামুটি একই থেকে গেছে, ইতরবিশেষ হয়নি তেমন একটা। প্রথম যে বিষয়টি জোর দিয়ে বলা দরকার তা হচ্ছে, জাতপাত, ধর্ম, লিঙ্গ, অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রমের জগৎ বিভক্ত। এর ফলে দেখা দেয় কিছু সমস্যা, যেমন বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রমিকের ক্ষেত্রে অনড়তা, বিশেষত মেয়েদের বেলায়; মজুরিতে নিদারুণ হেরফের এবং বৈষম্য। ছেলেদের তুলনায় মেয়ে শ্রমিক বরাবরই প্রায় ২০ শতাংশের মতো কম। সাম্প্রতিক সরকারি হিসেব মোতাবেক দেশে মহিলা কর্মী ২৫-৩০ শতাংশ। আর্থ-সামাজিক শ্রেণি, শহর ও গ্রামাঞ্চল এসবের ভিত্তিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যায় তারতম্য হয় যথেষ্ট (মজুমদার ও পিল্লে)। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও)-এর উইমেন অ্যান্ড ওয়ার্ক, ২০১৬ রিপোর্টটির তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মধ্যে ভারতে নারী-পুরুষের মজুরিতে ফারাক সবচেয়ে বেশি ২৬ শতাংশ। এমনকি, এশিয়ার নিরিখেও তা তাৎপর্যময়ভাবে বেশি। এশিয়ায় গড় পার্থক্য ২৩ শতাংশ এবং উন্নত বিশ্বে এই তফাৎ তো ১৫ শতাংশেরও কম।

ভারতের শ্রম ক্ষেত্রে আর এক বৈশিষ্ট্য হল, কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা প্রচুর। মোট শ্রমিকের ৫০ শতাংশের কাছাকাছি কৃষিতে খাটে। এখানে মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, হালফিলের হিসেব অনুযায়ী, দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ আসে চাষবাস থেকে। কৃষিতে কর্মীদের এই ভিড়ভাট্টা এবং এর 'ছদ্ম বা আধা বেকারত্বের' কাঠামো খাড়া হয়েছে বিস্তর মজুর হাজির হওয়ায় এবং চাষির সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকার দরুন। অ-কৃষি ক্ষেত্রে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (ঠিক কৃষির মতোই) অসংগঠিত কর্মসংস্থান—অল্প মজুরি, নেই কাজের নিশ্চয়তা, না আছে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, কোনও মতে দিন গুজরান। কর্মীদের মোটামুটি অর্ধেক অ-কৃষিতে নিযুক্ত, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮০ শতাংশ কিন্তু এই ক্ষেত্রের অবদান। অথচ অ-কৃষির মাত্র ১০ শতাংশেরও কম সংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে। এই সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের প্রায় ৬৫-৭০ শতাংশ নিযুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে (সরকারি প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা বাহিনী-সহ)। অসরকারি ক্ষেত্রে মূলত বড়ো বড়ো কলকারখানা ও বিভিন্ন পরিষেবা শিল্পে কাজ করে ২ কোটি ৯২ লক্ষের মতো লোক। এদের ১৬ শতাংশের বরাতে জুটেছে অসংগঠিত কর্মসংস্থান (পালোলা ও সাহু, ২০১২)।

সার্বিকভাবে, ভারতে শ্রম ক্ষেত্রের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এক অনিশ্চয় ও উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে; স্বাধীনতা ইস্তক অবশ্য দেশের উন্নয়ন ধারায় এটাই চলে আসছে। তবে নব্বই দশকের গোড়ায় তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কারের জমানার শুরু থেকে, এই অনিশ্চয়তা-উদ্বেগ বেড়ে গেছে ঢের। এই সময়কালে ভারতে কৃষির দশা আরও বেহাল। সমষ্টিগত অর্থনীতির নীতি বদল ও প্রাথমিক ক্ষেত্রে সরকারি লগ্নি

কমতে থাকায় কৃষিতে মজুর নিয়োগে ভাটার টান এ জন্য দায়ি। রুজি-রোজগার খুইয়ে পেটের দায়ে কৃষি-শ্রমিকরা ভিড় জমায় অ-কৃষিক্ষেত্রে। হা হতোস্মি! কলকারখানা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রেও ভদ্রগোছের বা জুতসই কাজ এসব ভূমিহীন ও অস্থায়ী কর্মীর তেমন একটা জুটছে কই। নব্বই দশকের প্রথম থেকে মোট জাতীয় আয়ে কলকারখানার হিস্যা আটকে আছে ১৫-১৬ শতাংশে। প্রায় ৮৫ শতাংশ কারখানায় কাজ চলে ১ বা ২ জনকে নিয়ে। স্পষ্টতই বোঝা যায় সেই কাজ কতখানি অনিশ্চিত, নিরাপত্তাহীন এবং স্বনিযুক্তির হার কতটা বেশি। এহ বাহ্য, এমনকি আর্থনীতিক বিকাশ হারে রমরমার সময়েও কাজের সুযোগ বেড়েছিল ছিটেফোঁটা এবং বিগত তিন দশক জুড়ে কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা মার খেয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রে। বিকাশ যা হচ্ছে তা প্রধানত পরিষেবা ক্ষেত্রে, সেখানে অস্থায়ী ও স্বনিযুক্তির পাল্লা ঢের ভারি। এর ফলে অর্থনীতির চড়া মাত্রায় অসংগঠিত থাকাটা নাছোড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা কিনা সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাড়ছে অনিশ্চয়তা-নিরাপত্তাহীনতার বহর

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল আউটলুক রিপোর্ট, ২০১৬-এর হিসেব, উন্নত দুনিয়ার ১২ শতাংশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৪৬ শতাংশ শ্রমিকের রোজগার জোটে অসংগঠিত কর্মসংস্থান থেকে। এর মধ্যে, এক দক্ষিণ এশিয়াতেই আছে দু'-তৃতীয়াংশ অসংগঠিত কর্মসংস্থান; অর্থাৎ কর্মীকুলের ৭২ শতাংশ। ভারতে তো ৯০ শতাংশের বেশি কর্মী যুক্ত আছে অসংগঠিত কাজকর্মে। সত্যি কথা বলতে, সংগঠিত ক্ষেত্রেও অসংগঠিত কর্মসংস্থানের অপ্রতিহত ধারা এক বড়ো মাথাব্যথার হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯-২০০০-এ তথাকথিত সংগঠিত ক্ষেত্রে ৩৭.৮ শতাংশ কর্মী ছিল অসংগঠিত। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (এনএসএসও)-এর হিসেবে, ২০১১-'১২-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪.৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে স্বনিযুক্তদের ৯৭ শতাংশ ও শহরে ৯৮ শতাংশের রোজগার জোটে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এছাড়া, গ্রামের দিকে ৭৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের ৮১ শতাংশ ঠিকা শ্রমিক আছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে।[৩] সুতরাং, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার ২০১১-'১২-র হিসেব (এটাই সবচেয়ে হালফিল) মাফিক, ৪৮ কোটি ৪৭ লক্ষ কর্মীর মধ্যে ৪৪ কোটি ৭২ লক্ষই অসংগঠিত। এদের অধিকাংশ অনিশ্চিত, অস্থায়ী ছুটকোছাটকা কাজ করে। তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি নগণ্য। আগেই বলেছি, অর্থনৈতিক সংস্কারের জমানায় অপেক্ষাকৃত উঁচু অর্থনৈতিক বিকাশ হার সত্ত্বেও, অসংগঠিত কর্মসংস্থান যাচ্ছে বেড়ে। সামাজিক ক্ষেত্রের কিছু বিষয় থেকে রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেওয়ায় শ্রমজীবী শ্রেণির বিপন্নতা-অসহায়তা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

নাছোড়বান্দা এই অসংগঠিত কর্মসংস্থানের দোহারকি দিচ্ছে নব্বই-এর দশকের গোড়া থেকে স্থায়ী কাজের সুযোগ থমকে যাওয়াটা। ১৯৮৭-'৮৮-তে পুরুষদের মধ্যে স্থায়ী কর্মী ছিল ১০ শতাংশ। তা ২০০৯-'১০-এ কমে যায় ৮.৫ শতাংশ। ২০১১-'১২-য় অবশ্য বেড়ে হয় ফের ১০ শতাংশ। গত কয়েক বছরে, নতুন কাজের সুযোগের ৮০ শতাংশের বেশি ছিল অস্থায়ী ধরনের। এসব কর্মসংস্থান সবচেয়ে বেশি হয়েছে নির্মাণ ক্ষেত্রে। শ্রমজীবী শ্রেণির আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা প্রতিফলিত হচ্ছে কর্মসংস্থানের ধরন বদলে। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে ইঙ্গিত মেলে যে ছোটো আকারের উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে উন্নত মানের কর্মসংস্থানে সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। স্বনিযুক্তির বাহুল্যও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এসব ছোটোখাটো সংস্থা এমন জায়গায় উৎপাদনের কাজ চালায় যাকে প্রথাগতভাবে কাজের স্থান আখ্যা দেওয়া যায় না। তাই এসব বহু কর্মী পায়নি "শ্রমিক"-এর স্বীকৃতি। শ্রম আইনের আওতার বাইরে থাকায়, শ্রমিকের অধিকার এদের জোটে না।

"শ্রমজীবী শ্রেণির আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা প্রতিফলিত হচ্ছে কর্মসংস্থানের ধরন বদলে। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে ইঙ্গিত মেলে যে ছোটো আকারের উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে উন্নত মানের কর্মসংস্থানে সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। স্বনিযুক্তির বাহুল্যও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এসব ছোটোখাটো সংস্থা এমন জায়গায় উৎপাদনের কাজ চালায় যাকে প্রথাগতভাবে কাজের স্থান আখ্যা দেওয়া যায় না। তাই এসব বহু কর্মী পায়নি "শ্রমিক"-এর স্বীকৃতি। শ্রম আইনের আওতার বাইরে থাকায়, শ্রমিকের অধিকার এদের জোটে না।"

কাজের সুযোগ না মেলায় বেকার গাদাগুচ্ছ। তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩-'৯৪-এ বেকারি কমেছিল অনেকখানি। কিন্তু ১৯৯৩-'৯৪ এবং ২০০৪-'০৫-এর মধ্যে বেকারি বাড়ে লাফ দিয়ে। সরকারি হিসেব মতে, শ্রমের বাজারে সদ্য ঢোকাদের কর্মসংস্থানের নিমিত্ত ফি বছর ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ কাজ সৃষ্টি করা দরকার। শ্রম কার্যালয় (Labour Bureau) থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক তথ্য অবশ্য এক্ষেত্রে এক নিদারুণ হতাশাজনক ছবি তুলে ধরে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য দরকারি কাজের সুযোগ সৃষ্টির ধারে কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, নতুন কাজ কমছে ৯০ শতাংশ; ২০১০-এ নতুন কাজ পেয়েছিল ১১ লক্ষ মানুষ, ২০১৬-তে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১.৫ লক্ষ।

চাই সামাজিক সুরক্ষা

তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার কালে, সরকারি মুখপাত্ররা হরবখত বলে থাকতেন, ভারতের শ্রম বাজার বড়ো বেশি অনমনীয় (বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক বিধির দরুন) এবং

তাই বিদেশি লগ্নির জন্য সংস্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের নীতি প্রণেতারা প্রায়শ মনে করিয়ে দেন যে "জনসংখ্যায় যুবাদের অংশ অপেক্ষাকৃত বেশি" থাকার সুবাদে ভারতের তুলনামূলকভাবে এক বড়ো সুবিধা আছে। এই যুবাদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রম বাজারে নমনীয়তা আনতে পারলে বিদেশি লগ্নি উৎসাহ পাবে এবং কাজের সুযোগ তৈরি হবে। আমি এসব সওয়াল-যুক্তি খুঁটিয়ে দেখার পর অন্যত্র এ নিয়ে আলোচনা করেছি (যেমন, ঝা, ২০১৬), অর্থনৈতিক তত্ত্ব থেকে খুবই স্পষ্ট যে শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ আপনা থেকে আর্থনীতিক বিকাশ বা কর্মসংস্থানের পথে অন্তরায় নয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, কর্মীদের এক ক্ষুদ্র ভাগ (এরা সংগঠিত ক্ষেত্রের অংশ) কিছুটা নিরাপত্তার ছত্রছায়া ভোগ করে। কিছু রাজ্যও এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি আইন ছাড়া, অসংগঠিত কর্মসংস্থান কার্যত শ্রম আইনের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। এই পটভূমি মনে রাখলে, ভারতের শ্রম বাজারে নমনীয়তার অভাব নিয়ে শোরগোল তোলা নিরর্থক। তাই, আমি অন্য জায়গায় (ঝা, ২০১৭) যুক্তি দেখিয়েছি, ভারতের ৯০ শতাংশ শ্রমিকের জন্য কার্যত আইন-কানুন নেই।

এই প্রেক্ষিতে, 'জাতীয় শ্রম বাজার'-এর এক পূর্ণাঙ্গ ভিসান বা চিন্তাভাবনা-সহ শ্রমিকের অধিকারের এক পরিকল্পনা ছকা ও তা রূপায়ণের চ্যালেঞ্জ আছে ভারতের নীতি রচয়িতাদের সামনে। এই চিন্তাভাবনায় জাতীয় ন্যূনতম মজুরি সমেত একগোছা প্রধান শ্রম স্ট্যান্ডার্ড বা মান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অসংগঠিত শ্রম বাজারের মোকাবিলায় নীতি এজেন্ডায় এর ঠাঁই থাকা উচিত সবার আগে। "সস্তা শ্রমিক" থেকে ফায়দা তোলার মনোভাবই মনে হয় শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনে বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের অনীহার পিছনে কাজ করছে। তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, এ দুয়েরই ভিত্তিতে এহেন দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহজনক।

অসংগঠিত কর্মীদের জন্য, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত এক জরুরি প্রয়োজন। এতে তাদের কাজের অবস্থার উন্নতি হবে এবং তারা মর্যাদা নিয়ে জীবন কাটাতে পারবে। এজন্য পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌল পরিষেবা বৃদ্ধি ও তার জোগান ব্যবস্থা উন্নত করার যুগপৎ প্রয়াস চালানো দরকার। এর ফলে কর্মীদের জাগতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং কর্মীকুলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অসহায়তা ও বিপন্নতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াগুলি উলটে দিতে তা সাহায্য করবে।❑

(লেখক 'Centre for Economic Studies and Planning (CESP)'-এর অর্থনীতির অধ্যাপক। ইমেল : praveenjha2005@gmail.com)

---

১ ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট সোশাল আউটলুক, আইএলও, ২০১৬, http://www.ilo.org/wcmsp5/group6/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_443472.pdf

২ ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট সোশাল আউটলুক, আইএলও, ২০১৬, http://www.ilo.org/wcmsp5/group6/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_443472.pdf

৩ এনএসএসও, ইনফরমাল সেক্টর অ্যান্ড দ্য কনডিশনস অব এমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া (জুন, ২০১১-জুলাই, ২০১২)। এনএসএসও, জুলাই, ২০১৪, পৃ. ii

উল্লেখপঞ্জি :

- Jha, Praveen. *The well-being of labour in contemporary Indian economy : what's active labour market policy got to do with it?* Geneva : ILO, 2009.
- Jha, Praveen. *"Labour in Contemporary India."* OUP Catalogue, 2016.
- Jha Praveen, 'Labour in Neo-Liberal India' *Seminar,* 689, 2017.
- Mazumdar, Indrani and N. Neetha. *Gender Dimensions : Employment Trends in India, 1993-'94 to 2009-'10.* No. id : 4502. Occasional Paper No. 56, Centre for Women's Development Studies, 2011.
- NSSO, Informal Sector and the Conditions of Employment in India (June 2011-July 2012). NSSO, July 2014.
- Papola, T. S. and Partha Pratim Sahu. "Growth and structure of employment in India." *Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi,* 2012.
- Raveendran, Govindan, Ratna M. Sudarshan and Joann Vanek. "Home-based workers in India : Statistics and trends." WIEGO Statistical Brief 10, 2013.
- World Employment Social Outlook, ILO, 2016, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_443472.pdf

ভারতে শ্রম সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা

*সেকেলে শ্রম আইনগুলিই এ দেশে শিল্প বান্ধব শ্রম বাজার গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। শ্রম আইনগুলি শ্রমিকদের অধিকার ও দাবি-দাওয়াগুলিকেই বজায় রেখে চলেছে। অথচ, দেশীয় শিল্পগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা চলে আসছিল ১৯৯১ সালের পর তা উঠে যায়। ১৯৯১ সালে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যে জমানার সূচনা হয় তার ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও ভারতীয় বাজারে প্রবেশের অনুমতি পায়। আর এতে এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সামগ্রিক চালচিত্রটাই বদলে যায়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে ঠিকা শ্রম বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিয়োগের মতো শ্রম আইন থাকাটা অত্যন্ত দরকার। কিন্তু একই সঙ্গে, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা এবং প্রথাগত, অপ্রথাগত, নির্বিশেষে সমস্ত শিল্পে শ্রম সংক্রান্ত মাপকাঠিগুলি মেনে চলা হচ্ছে কি না তা সুনিশ্চিত করাটাও সমানভাবে জরুরি। লিখেছেন—***শ্রীরঙ্গ ঝা***

শ্রম আইনে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগী ও শিল্পপতিদের কাছে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার পথ আরও সহজতর করে তোলাকেই আপাতভাবে শ্রম সংস্কার বলে ধরে নেওয়া হয়, যাতে তারা কঠোর শ্রম আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পান বা রাষ্ট্রের তরফে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পান। কিন্তু শ্রম সংস্কারের জন্য শ্রম সংক্রান্ত আইনগুলির পরিবর্তন বা বিক্ষিপ্তভাবে সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলির আওতার বৃদ্ধিই কিন্তু যথেষ্ট নয়। এর জন্য সবার আগে শ্রম বাজারের খোলনলচে বদলানো একান্ত প্রয়োজন। মূলত দু'টি কারণে এটাই ভারতে শ্রম সংস্কারের আদর্শ সময়। প্রথমত, গত এক দশকে চিনে শ্রমের মূল্য তিন গুণ বেড়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে এত দিন যে সুবিধা সে দেশটি ভোগ করে আসছিল তা তারা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। দ্বিতীয়ত, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে ভারত সরকারও এ দেশে উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে বিনিয়োগকারী ও বৃহৎ মাপের বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে যথা সম্ভব উৎসাহ দিয়ে চলেছে। এখন কত দ্রুত এ দেশে শ্রম সংস্কারের উদ্যোগ গতি পায় তার ওপর কিন্তু 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিযোগিতার বাজারে এগিয়ে যাওয়া শ্রম সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতে শ্রম বাজার সংস্কারের উদ্যোগ বরাবরই এগিয়েছে শম্বুক গতিতে। এমনকী ১৯৯১ সালে ভারতে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের জামানার সূচনার পরেও এ দেশের শ্রম বাজারে তার প্রভাব পড়েছে সামান্যই। ফলে শ্রম বাজারের কঠোর নিয়ম-কানুন, মান্ধাতার আমলের শ্রম আইন তথা চোখে পড়ার মতো দক্ষতার অভাবের কারণে ভারত যে একটি 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' হয়ে ওঠার সুযোগ হারিয়েছে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। গত পঁচিশ বছরে শ্রম বাজারের নিয়ম-কানুন শিথিল করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইনগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও বিদেশি বিনিয়োগ টানার ব্যাপারে, বিশেষ করে চর্মজাত দ্রব্য, বস্ত্র, (পোশাক-আশাক, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র), মূল্যবান রত্ন ও অলংকার, ক্রীড়া সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, রবারের জিনিসপত্র, তৈরি ধাতুদ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভারতের শ্রম বাজার অদ্ভুতভাবে উদাসীন রয়ে গেছে। শ্রমের মানের সঙ্গে আপস না করেও শ্রমিকদের উচ্চ উৎপাদনশীলতা, শ্রম বাজারের নমনীয় নিয়ম-কানুন, সস্তার শ্রমের ওপর নির্ভর করে ভারতকে বিশ্বের উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করে তুলতে শ্রম সংস্কারের উদ্যোগকে এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। এতে ভারতের জন বিন্যাসগত সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে।

মান্ধাতার আমলের শ্রম আইনগুলির জটিলতা, আমলাতন্ত্রের অকারণ হস্তক্ষেপ তথা দুর্নীতিপরায়ণ ইন্সপেকটর রাজের সামনে কারখানা মালিকদের ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকার ফলে শ্রমিকদের কল্যাণ যেমন বাধা পেয়েছে তেমনই সামগ্রিকভাবে দেশের শ্রম বাজারের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। তাই শ্রম বাজারের উদারীকরণ আজ একান্তভাবে প্রয়োজন। শ্রম আইনগুলিকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে চালু করতে হবে স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কারখানা পরিদর্শন ও আইন-কানুন মানতে বাধ্য করানোর ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিবৃতি দান বা ঘোষণাপত্র জারি করা এবং সেই সঙ্গে স্বেচ্ছায় শ্রম সংক্রান্ত মাপকাঠিগুলি মেনে চলার ব্যবস্থা অনেক বেশি করে দরকার।

শ্রম বাজারের উদারীকরণ ঘটলে সামগ্রিকভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা যেমন আসবে তেমনই দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিসরও যে বাড়বে তা বোধহয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিয়োগকর্তাদের ইচ্ছে মতো নিয়োগ ও ছাঁটাই তথা বাজারের আপৎকালীন পরিবেশ

পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মীদের নিয়োগের শর্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রম আইনগুলির সংশোধনের ওপর খুব বেশি জোর দিয়ে থাকেন খোলা বাজারের প্রবক্তারা। কিন্তু এই ধরনের চরমপন্থী ধ্যানধারণা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, উৎপাদন তথা পরিষেবা ক্ষেত্রকে প্রতিযোগিতামুখী করে তোলার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কারের যে উদ্যোগ, তার পথে এই ধরনের মনোভাব মস্ত বড়ো বাধা।

আরেক শ্রেণির চিন্তাবিদ পুরোনো আমলের শ্রম আইনগুলিকে যুক্তিসঙ্গত করে ঢেলে সাজানোর পক্ষে যুক্তি দেন। তারা নব্য উদারপন্থীদের বিপরীতে গিয়ে শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন ও তাদের পূর্ণ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রম বাজারকে আরও নমনীয় করে তোলার কথা বলেন। অন্যদিকে, যে কোনও মূল্যে ম্যানেজার বা পরিচালকদের বিশেষ ক্ষমতা বজায় রাখা এবং শ্রমিক নিয়োগ, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের অবাধ ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী নব্য উদারপন্থীরা। একথা মেনে নিতে অবশ্য কোনও দ্বিধা নেই যে স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারতের শ্রম বাজারে কোনও মতে আদেশ পালনের মনোভাবই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে এবং সেই সঙ্গে শ্রম বাজার, মূলধনী বাজার ও পণ্য বাজারের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাগুলি স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে গত ২৫ বছরে আদেশ পালনের চাপ ও ইন্সপেকটর রাজের ভয় অনেকটাই দূর হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল চুক্তি শ্রম আইনকে তোয়াক্কা না করে সরকারই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান নিয়োগকর্তা হয়ে উঠেছে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারি সংস্থাগুলিও তাদের প্রধান প্রধান কাজকর্ম পরিচালনার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগে আরও বেশি করে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। শ্রম আইনগুলি মেনে চলার ব্যাপারে সরকারের তরফে কড়াকড়ি না থাকায় বেসরকারি সংস্থাগুলির পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। এমনকী শিল্প বিরোধ সংক্রান্ত মামলাগুলির রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে আদালতও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবমুখী। এ ক্ষেত্রে ১৯৯১-এর আগেকার অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এসেছে আদালত। ওই সময়টায় শ্রমিক ও মালিক পক্ষের বিবাদ নিরসনের মামলাগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পক্ষেই রায় দিতেন বিচারকরা।

"বৃত্তিমূলক বা পেশামূলক দক্ষতার বিচারে মেক্সিকোর মতো উন্নয়নশীল দেশের চেয়েও পিছিয়ে রয়েছে ভারত। মেক্সিকোতে যুব সম্প্রদায়ের ২৮ শতাংশের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে। একটি সর্বাত্মক শ্রম নীতির অভাবই এক উদার খোলামেলা শ্রম বাজার গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায়। অথচ এই ধরনের একটি বাজার গড়ে তোলা গেলে দেশে একটি প্রতিযোগিতামুখী উৎপাদন ও পরিষেবা শিল্পের পরিবেশ গড়ে তোলার কাজটাও অনেক সহজ হয়। এ বিষয়ে অনেক সমীক্ষা, প্রতিবেদন পেশ, আলাপ-আলোচনা, বৈঠক হয়েছে। কিন্তু একটি সর্বাত্মক জাতীয় শ্রম নীতি এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। তার পরিবর্তে সরকার বিভিন্ন সময়ে আংশিকভাবে শ্রম আইন সংস্কারের মধ্যেই নিজের দায়িত্ব সীমিত রেখেছে।"

শ্রম আইনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তার আগেকার অনড় মনোভাব থেকে সরে এলেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে বাদ দিয়ে দু' পক্ষের মধ্যে ঐচ্ছিক চুক্তির ভিত্তিতে কর্মনিযুক্তির যাবতীয় শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের ভার পুরোপুরি নিয়োগকর্তাদের হাতে তুলে দিতে কিন্তু রাজি নয় সরকার। যোজনা কমিশনের সমীক্ষায় (২০০১) এই বিষয়ে সরকারের মতামতের যৌক্তিকতাকেই তুলে ধরা হয়েছে : 'পণ্য বাজারের তুলনায় শ্রম বাজারের ওপর কেন যে আইনের নিয়ন্ত্রণ রাখাটা বেশি জরুরি তা সুবিদিত। শ্রমিকরা পণ্য সামগ্রী নয়, তারা মানুষ এবং দেশের নাগরিক এবং নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের মধ্যে শ্রমিকরা এককভাবে দুর্বলতর পক্ষ। যৌথ দরাদরি তথা সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গড়ে তোলার ব্যাপারে নিয়োগকর্তাদের ন্যূনতম দায়বদ্ধতা বেঁধে দেওয়ার জন্য কর্মী সংগঠন বা ইউনিয়ন গঠন বা আরও বিভিন্ন বিষয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে আইনগুলি রয়েছে সেগুলি আদতে এই ভাবনারই ফসল। উন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই প্রথাই স্বীকৃত; তবে দেশভেদে আইনগুলির চরিত্র ভিন্ন'।

ভারত সরকার শ্রমিক তথা মালিক পক্ষের স্বার্থরক্ষায় সমানভাবে আগ্রহী। যোজনা কমিশনের সমীক্ষার (২০০১) নিম্নোক্ত অংশে সরকারের এই ভাবনার কথা একেবারে পরিষ্কার :

'শ্রমিকদের বৈধ স্বার্থরক্ষায় নিঃসন্দেহে আমাদের শ্রম আইন চাই, কিন্তু তার ফলে সৃষ্ট আইনি কাঠামোয় কর্মচারীদের বৈধ অধিকার রক্ষার লক্ষ্য পূরণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতায় উৎসাহ দান এবং সামগ্রিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য উৎসাহমূলক উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থার লক্ষ্যপূরণও জরুরি। আইন এবং এই আইনগুলি রূপায়ণের পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উৎসাহমূলক কাঠামো গড়ে তোলার সুযোগ পান। যেমন, পরিবর্তিত প্রযুক্তি এবং বাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কর্মীবাহিনীর পুনর্বিন্যাস এবং তাদের অদল-বদল করে

নেওয়ার ছাড় নিয়োগকর্তাদের দেওয়া। এই ধরনের নমনীয়তার প্রয়োজন এখন আরও বেশি করে দেখা দিচ্ছে। কারণ উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের গতি নমনীয়তার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে'।

সেকেলে শ্রম আইনগুলিই এ দেশে শিল্প বান্ধব শ্রম বাজার গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। শ্রম আইনগুলি শ্রমিকদের অধিকার ও দাবি-দাওয়াগুলিকেই বজায় রেখে চলেছে। অথচ, দেশীয় শিল্পগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা চলে আসছিল ১৯৯১ সালের পর তা উঠে যায়। ১৯৯১ সালে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যে জমানার সূচনা হয় তার ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও ভারতীয় বাজারে প্রবেশের অনুমতি পায়। আর এতে এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সামগ্রিক চালচিত্রটাই বদলে যায়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে ঠিকা শ্রম বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিয়োগের মতো শ্রম আইন থাকাটা অত্যন্ত দরকার। কিন্তু একই সঙ্গে, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা এবং প্রথাগত, অপ্রথাগত, নির্বিশেষে সমস্ত শিল্পে শ্রম সংক্রান্ত মাপকাঠিগুলি মেনে চলা হচ্ছে কি না তা সুনিশ্চিত করাটাও সমানভাবে জরুরি।

দেশজুড়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দক্ষতার অভাবও ভারতের শ্রম বাজারের পক্ষে এক অন্যতম প্রতিবন্ধক। মান্ধাতার আমলের শ্রম আইনের চেয়েও এই দক্ষতার অভাবজনিত কারণেই ভারতের শ্রম বাজারে বিশেষত প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ মূলত অধরাই রয়ে গেছে। বড়ো বড়ো দেশীয় সংস্থা তো বটেই এমনকী, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের উদ্যোগপতিদেরও দক্ষ মানবসম্পদের জোগান পেতে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়। যোজনা কমিশনের এক সমীক্ষায় (২০০১) দেখা গেছে যে, গ্রামাঞ্চলে পুরুষ শ্রমিকদের মাত্র ১০.১ শতাংশের এবং মহিলা শ্রমিকদের মাত্র ৬.৩ শতাংশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট এবং বাজারের উপযোগী দক্ষতা রয়েছে। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে পুরুষ শ্রমিকদের মাত্র ১৯.৬ শতাংশ এবং মহিলা শ্রমিকদের মাত্র ১১.২ শতাংশের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে। এছাড়া এ দেশে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়ঃসীমার শ্রমিক শ্রেণির মাত্র ৫ শতাংশের মধ্যে বৃত্তিমূলক দক্ষতা রয়েছে সেখানে শিল্পোন্নত অন্যান্য দেশে এই হার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে (যোজনা কমিশন, ২০০১)।

বৃত্তিমূলক বা পেশামূলক দক্ষতার বিচারে মেক্সিকোর মতো উন্নয়নশীল দেশের চেয়েও পিছিয়ে রয়েছে ভারত। মেক্সিকোতে যুব সম্প্রদায়ের ২৮ শতাংশের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে। একটি সর্বাত্মক শ্রম নীতির অভাবই এক উদার খোলামেলা শ্রম বাজার গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায়। অথচ এই ধরনের একটি বাজার গড়ে তোলা গেলে দেশে একটি প্রতিযোগিতামুখী উৎপাদন ও পরিষেবা শিল্পের পরিবেশ গড়ে তোলার কাজটাও অনেক সহজ হয়। এ বিষয়ে অনেক সমীক্ষা, প্রতিবেদন পেশ, আলাপ-আলোচনা, বৈঠক হয়েছে। কিন্তু একটি সর্বাত্মক জাতীয় শ্রম নীতি এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। তার পরিবর্তে সরকার বিভিন্ন সময়ে আংশিকভাবে শ্রম আইন সংস্কারের মধ্যেই নিজের দায়িত্ব সীমিত রেখেছে। এছাড়া, জাতীয় উৎপাদন নীতি, শিশু শ্রম সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক জাতীয় নীতি, জাতীয় কর্মনিযুক্তি নীতি; এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক জাতীয় নীতি এবং কাজের দুনিয়া এবং কর্মস্থলে নিরাপত্তা স্বাস্থ্য ও পরিষেবা বিষয়ক জাতীয় নীতিতেও শ্রম সংক্রান্ত নানা বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নথির খসড়ায় শেষবারের মতো 'শ্রম নীতি'-র উল্লেখ পাওয়া যায়, যা আজকের দিনের পক্ষে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সরকারের এই দিশাহীন এবং সাময়িক, অস্থায়ী সব পদক্ষেপ সারা বিশ্বের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম বাজারের উদারীকরণ ঘটাতে পারেনি।

ভারতে শ্রম সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে পুরোনো আমলের শ্রম আইনগুলিতে পরিবর্তন আনার বিষয়টি। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার নির্যাসকে তুলে ধরেছে যোজনা কমিশন (২০০১), 'এই সমস্ত আইনের একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। এই আইনগুলির আরও সরলীকরণ প্রয়োজন এবং বিশেষত বর্তমানের আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন-সহ সমকালীন বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা দরকার। অনেক সময়, কোনও বিশেষ আইনকে নিয়ে হয়তো ততটা সমস্যা হয়নি, যতটা সমস্যা হয়েছে দীর্ঘ, এক কথায় প্রায় অনন্ত আইনি লড়াই নিয়ে। এতে শ্রমিক নিয়োগের মূল্য এবং আনুষঙ্গিক 'ঝঞ্ঝাট' অনেক বেড়ে গেছে। এছাড়া আইন বলবৎ করার ব্যবস্থাপনাতেই অনেক গলদ রয়ে গেছে, যেমন—আইন

"একটি ব্যাপক এবং সর্বাত্মক জাতীয় শ্রম নীতি ছাড়া শ্রম বাজারের জন্য হঠাৎ করে কোনও যুগান্তকারী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ অসম্ভব। তাই শিল্পমহলকে খুশি করার জন্য মাঝে মধ্যে শ্রম আইনগুলির কোনও কোনও ধারা সংশোধনের সাময়িক ব্যবস্থার চেয়ে শ্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে একটি জাতীয় কাঠামো নীতির ওপর ঐকমত্য গড়ে তোলার ওপর সবার আগে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। যেহেতু গত কুড়ি বছরে অনেক সমীক্ষা, আলাপ-আলোচনা ও সংস্কারের কাজ হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের অভাব-অভিযোগগুলি নিয়ে একটি জাতীয় শ্রম নীতির খসড়া তৈরির কাজটা তাই খুব কঠিন হবে না।"

প্রয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক পরিদর্শকের দায়িত্বের কথাই বলা যায়। শিল্পমহলের তরফে বারবার এই অভিযোগ উঠেছে যে উৎকোচ আদায়ের জন্য নিয়োগকর্তাদের হয়রান করতে নিজেদের বিপুল ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে এই ইন্সপেকটর রাজ। এই ব্যবস্থায় বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ছোটোখাটো শিল্পোদ্যোগীরা। অন্যদিকে কর্মী সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঠিক বিপরীত মত পোষণ করে বলে যে, শ্রম আইনগুলি আরও ভালোভাবে বলবৎ করার জন্য শ্রম সংক্রান্ত বিধিগুলি বলবৎকরণের ব্যবস্থাপনাকে আরও মজবুত করা প্রয়োজন'।

চালু শ্রম আইনগুলি থেকে সব রকমের ধোঁয়াশা, দ্বিচারিতা এবং অযৌক্তিকতা মুছে ফেলাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে আইনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দেশের শ্রম বাজারের বিপুল সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে শিল্পমহল। শ্রম আইনগুলিকে এমন হতে হবে যাতে তা কর্মসংস্থানের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। কঠোর শ্রম আইনের ফল হিসাবে 'আদেশ পালনের যে মনোভাব' আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তার আগল থেকে যত দ্রুত আমরা বেরিয়ে আসতে পারব, উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার বাজারে তত ভালোভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। চালু শ্রম আইনগুলিকে সব একত্রিত করে একটি অভিন্ন আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করার পক্ষে সরকারের কাছে এটাই আদর্শ সময়। এই প্রস্তাবিত আইনের একটা নির্দিষ্ট অংশে থাকবে শ্রমিক-মালিক পক্ষের সম্পর্ক, বেতন, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মস্থলে নিরাপত্তা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ, নিয়োগের শর্তাবলী, কর্মী সংগঠনগুলির স্বীকৃতি, যৌথ দরাদরি সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচলিত শ্রম সংক্রান্ত মাপকাঠিগুলির প্রয়োগের কথা। এই ধরনের একটি যুগান্তকারী আইন প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছেও একটি আদর্শ হয়ে থাকবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় আইনটিকেই গ্রহণ করতে পারে অথবা আঞ্চলিক বিষয়গুলির উল্লেখ রাখতে আইনে সামান্য কিছু পরিবর্তন এনে কেন্দ্রীয় আইনটির আদলেই নিজস্ব আইন তৈরি করে নিতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা প্রথাগত-অপ্রথাগত সমস্ত ক্ষেত্রের সব শ্রমিককে এর আওতায় আনা গেলে তবেই এই ধরনের আইন সফল হবে।

একটি ব্যাপক এবং সর্বাত্মক জাতীয় শ্রম নীতি ছাড়া শ্রম বাজারের জন্য হঠাৎ করে কোনও যুগান্তকারী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ অসম্ভব। তাই শিল্পমহলকে খুশি করার জন্য মাঝে মধ্যে শ্রম আইনগুলির কোনও কোনও ধারা সংশোধনের সাময়িক ব্যবস্থার চেয়ে শ্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে একটি জাতীয় কাঠামো নীতির ওপর ঐকমত্য গড়ে তোলার ওপর সবার আগে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। যেহেতু গত কুড়ি বছরে অনেক সমীক্ষা, আলাপ-আলোচনা ও সংস্কারের কাজ হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের অভাব-অভিযোগগুলি নিয়ে একটি জাতীয় শ্রম নীতির খসড়া তৈরির কাজটা তাই খুব কঠিন হবে না।

উৎপাদন শিল্প জগতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার রমরমার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সত্ত্বেও চাকরি-বাকরির সুযোগ সেভাবে সৃষ্টি হচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে সরকারকে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মকাণ্ড সূচনার পর বিনিয়োগ আসতে শুরু করলেও তার ফলস্বরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির যে আশা করা হয়েছিল তা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। তাই বৃহত্তর যুব সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে দেশের সরকারকে এখন চাকরি-বাকরির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হতে হবে যাতে তরুণ-তরুণীরা নিজেদের আরও দক্ষ করে পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পায়। আর এজন্য উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন।

মালিক পক্ষের হাতে শোষিত, নিপীড়িত হওয়ার আশঙ্কায় প্রতিনিয়ত সন্ত্রস্ত না থেকে শ্রম বাজারের উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীরা যখন উৎপাদন ও পরিষেবা প্রদান ক্ষেত্রকে উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে নিজেদের প্রস্তুত রাখবেন তখন প্রকৃতপক্ষে শ্রম সংস্কার সম্ভবপর হবে। তাই ভারতে সরকারের তরফে বিভিন্ন শ্রম আইন পরিবর্তনের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলি অবশ্যই কাম্য, কিন্তু একইসঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের ওপরও সমানভাবে নজর দেওয়া দরকার।❑

(লেখক নয়া দিল্লিস্থিত 'Centre for Public Policy and Governance, Apeejay School of Management'-এর সহযোগী অধ্যাপক। ইমেল : jha.srirang@gmail.com)

তথ্য সূত্র :

- Jha, Srirang, 2015, Make in India, FIIB Business Review, Vol. 4, No. 2, June 2015.
- Planning Commission, 2001, Report of the taskforce on employment opportunities.
- http://planningcommission.nic.nin/aboutus/taskforce/tk_empopp.pdf

ভারতে অসংগঠিত শ্রম বাজার

স্বাধীনতা লাভের সময় ভারত ছিল মূলত কৃষি নির্ভর এক অর্থনীতি। স্বাধীনতার পর মহলানবিশ স্ট্রাটেজিতে জোর দেওয়া হয় মূলধন-প্রগাঢ় শিল্পে। বহুকাল থেকে ভারতে অসংগঠিত কর্মীরা সংখ্যায় বিপুল। গত চার দশকে হিন্দু বিকাশ হার বা নিচু বিকাশ হার-এর বেড়ি খসিয়ে ভারত এক দ্রুত বিকাশশীল দেশ হয়ে উঠেছে। নব্বই-এর দশকের গোড়ায় উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের পরবর্তী কালেও অসংগঠিত কর্মীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর কারণ সুলুকসন্ধান, অসংগঠিত কর্মীদের বেহাল দশা, তাদের কল্যাণের জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আইন নিয়ে কলম ধরেছেন—**এ. শ্রীজা**

ভারতের শ্রম বাজারে দু'টি ভাগ। এখানে ৯২ শতাংশ শ্রমিকের রুজি-রোজগার জোটে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে ১০ শতাংশেরও কম কর্মী। উপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসা আর্থ-সামাজিক অবস্থাই অসংগঠিত ক্ষেত্রে এত বেশি কর্মীর ভেড়ার কারণ। উপনিবেশিক জমানায়, উৎসাহ দেওয়া হ'ত কাঁচামাল রপ্তানি ও তৈরি পণ্য আমদানিতে। ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব ভারতের শিল্পায়নে তেমন কোনও অবদান রাখতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে এ দেশে কিছু কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। যুদ্ধের রসদ জোগানই ছিল এর লক্ষ্য। স্বাধীনতালাভের সময় তাই আমরা ছিলাম মূলত কৃষি নির্ভর এক অর্থনীতি। শিল্প-শ্রমিকরা ছিল সংখ্যায় অল্প। এই শ্রমিকদের মধ্যে চলত জাতপাতের দ্বন্দ্ব কেননা অ-কৃষি পেশা মূলত ছিল জাতভিত্তিক। শিল্পোদ্যোগীরা উঠে আসত গুটিকয়েক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে। শিল্প বলতে বোঝাত লোহা, ইস্পাত, খনি, বস্ত্র, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর, শিল্পায়নের মহলানবিশ স্ট্র্যাটেজিতে জোর দেওয়া হয় মূলধন-প্রগাঢ় শিল্পে। শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে মনোযোগ পড়ে অ-কৃষিতে গ্রামীণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে এবং ছোটো ও মাঝারি ক্ষেত্রে কিছু শিল্প সংরক্ষণের দ্বারা। কৃষি, হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত, ছোটো ও গ্রামীণ শিল্পের তাই প্রসার হয়নি। আকারে তারা ছোটো থেকে গেছে এবং এসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীরা স্বভাবতই ছিল অসংগঠিত। ১৯৭৭-'৭৮-এ ৯২.২ শতাংশ কর্মীর রুজি-রোজগার হ'ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এটা বেড়ে ১৯৯৩-'৯৪-এ দাঁড়ায় ৯২.৭ শতাংশ। বহুকাল থেকে তাই ভারতে অসংগঠিত কর্মীরা সংখ্যায় বিপুল। নব্বই দশকের গোড়ায় উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের পালা শুরু হতে এটা আরও বেড়েছে, এই যা।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির জন্য জাতীয় কমিশন বলেছে, ব্যক্তি বা পরিবারের মালিকানায় ব্যক্তিগত বা অংশীদারি ভিত্তিক ও দশের কম কর্মী নিয়ে চলা পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন ও বিক্রিতে নিযুক্ত কোম্পানি ব্যতিরেকে সব বেসরকারি সংস্থা অসংগঠিত ক্ষেত্র। সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রে অসংগঠিত কর্মী আছে। কমিশনের সংজ্ঞামাফিক, "অসংগঠিত ক্ষেত্র বা ঘর-গেরস্থালিতে নিযুক্ত কর্মীরা অসংগঠিত শ্রমিক, নিয়োগকর্তা এক্ষেত্রে কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ দিলে সেসব শ্রমিক অসংগঠিত শ্রমিক রূপে গণ্য হবে না এবং নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধে না পেলে সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীও অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবে।" কমিশনের এই সংজ্ঞা মতে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার (এনএমএসও) ইউনিট স্তরের তথ্য থেকে অসংগঠিত কর্মসংস্থানের ধাঁচ বোঝা যাবে সারণি-১ থেকে।

সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, অসংগঠিত কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০-এর ৯১.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৪-'০৫-এ হয়েছে ৯২.৭ শতাংশ। তবে এটা একটু কমে ২০১১-'১২-তে দাঁড়ায় ৯১.৯ শতাংশ। অসংগঠিত শ্রমিকের অনুপাত এত বেশি কেননা কর্মীকুলের অর্ধেকের বেশি স্বনিযুক্ত এবং তারা খাটে অসংগঠিত কৃষি ক্ষেত্রে। কলকারখানার ক্ষেত্রে ভারি শিল্পে জোর দেওয়া এবং ভোগ্যপণ্যের বেলায় ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য সংরক্ষণ নীতির দরুন শিল্প সংস্থার আকার বড়ো না হওয়ায় ভালো কাজের সুযোগ তেমন একটা সৃষ্টি হয়নি। ভরতুকি ও ছাড়ের সুযোগ নেওয়ার জন্য উদ্যোগীরা তাদের কারখানা বড়ো করার ঝোঁক থেকে বিরত থেকেছে। ১৯৯১-এর পর, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ, বিদেশি অর্থনীতির জোর প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে অসংগঠিত কর্মসংস্থান আরও বেড়েছে বিশেষত সংগঠিত ক্ষেত্রে। সংগঠিত ক্ষেত্রে অসংগঠিত কর্মী ১৯৯৯-২০০০-এর ৩৭.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-'০৫-এ দাঁড়ায় ৪৮ শতাংশ। ২০১১-'১২-তে ৫৪.৬ শতাংশ।

গত চার দশকে, ভারত হিন্দু বিকাশ হার, অর্থাৎ নিচু বিকাশ হার-এর বেড়ি খসিয়ে এক দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, শ্রমের বাজারে কাঠামোগত রূপান্তরের সুবাদে কৃষিতে মজুরের অনুপাত কমেছে এবং সেই মজুররা ভিড় জমিয়েছে নির্মাণ শিল্প ও কম দক্ষতার পরিষেবা ক্ষেত্রে অসংগঠিত কর্মী হিসেবে। উদারীকরণের পর, তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও সংরক্ষণ এবং ভরতুকি তুলে নেওয়ায় ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার ফলে উদ্যোগীরা বিধি-নিয়ম, কর কাঠামো, কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা-সহ শ্রম আইন মেনে চলা থেকে অব্যাহতি পেতে তাদের সংস্থা ছোটোখাটোই রেখে চলেছে। সংস্থার বহর বাড়াতে উদ্যোক্তাদের এই অনীহার দরুন উদারীকরণের পর ঠিকে ও চুক্তি কর্মী নিয়োগ গেছে বেড়ে। এছাড়া,

বহুজাতিক সংস্থাগুলির বাইরের দেশ থেকে আউটসোর্সিং ও সাব কনট্রাক্ট বাড়ায় অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চুক্তি কর্মী ছাঁটাই করার ক্ষেত্রে ১৯৪৭-র শিল্প বিবাদ আইনের বিধি-নিষেধের ঝক্কি সামলানো থেকে নিয়োগকর্তা ঝাড়া হাত-পা। দ্রুত প্রযুক্তি উদ্ভাবনার সুবাদে নিত্যনতুন উন্নত পণ্য হাজির হওয়ায় আগের মাল আর বাজারে কলকে পাচ্ছে না, তার আয়ু যাচ্ছে কমে। মূলধনী দ্রব্যের আমদানি শুল্কে মিশছে কিছু ছাড় বা পুরোপুরি রেহাই। অবাধ বাজারের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ক্ষুদ্র কারখানা মালিকরা কর্মী ছাঁটাই এবং চুক্তি মজুরের দিচ্ছে ঝুঁকেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেও খরচ কমানোর জন্য অসংগঠিত কর্মী নিয়োগের এক প্রবণতা মাথাচাড়া দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক সুমারির হিসেবে, ৬ জনের কম কর্মী নিয়ে চলা সংস্থা ১৯৯০-এর ৯৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৩-য় পৌঁছয় ৯৫.৫ শতাংশে। ওই সময়কালে ১০ জনের কম কর্মীর সংস্থা ৩.৫ শতাংশ থেকে সামান্য কমে হয় ৩.১ শতাংশ। ১০-এর বেশি শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ১৯৯০-এর ৩.১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩-তে হয় ১.৪ শতাংশ এবং কর্মসংস্থানে তাদের অবদান ওই সময়কালে ৩৭.১ থেকে নেমে দাঁড়ায় ২১.২ শতাংশ।

এভাবে কর্মসংস্থান সংকোচন/অস্থায়িত্বের দরুন কর্মীরা খোয়াচ্ছে চাকরির নিরাপত্তা, হারাচ্ছে নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের চিকিৎসার সুবিধা, পেনসন, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, ন্যূনতম মজুরি, বাড়তি সময়ের কাজ বাবদ অতিরিক্ত বা ওভারটাইম মজুরি ইত্যাদি ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা।

বেড়ে চলা এই অসংগঠিতকরণের মোকাবিলায় গড়া হয়েছে হরেক কমিটি ও কমিশন। যেমন, শ্রম সংক্রান্ত দ্বিতীয় জাতীয় কমিশন (২০০২), 'দশম যোজনায় ফি বছর ১ কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ' (২০০২) নিয়ে এস. পি. গুপ্ত রিপোর্ট, ১ কোটি কর্মসংস্থান সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স বা বিশেষ কর্মীবাহিনী (২০০২), অসংগঠিত ক্ষেত্রে সংস্থাগুলির জন্য জাতীয় কমিশন (২০০৪-২০০৮)। এসবের রিপোর্ট থেকে উঠে আসা তথ্যে

সারণি-১
সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে সংগঠিত এবং অসংগঠিত কর্মী
(১০ লক্ষের হিসেবে, বন্ধনীতে শতাংশ রূপে)

	১৯৯৯-২০০০		
	সংগঠিত	**অসংগঠিত**	**মোট**
সংগঠিত	৩৩.৭	১.৪	৩৫
	(৬২.৩)	(০.৪১)	(৮.৮)
অসংগঠিত	২০.৫	৩৪১.৩	৩৬১.৭
	(৩৭.৯)	(৯৯.৬)	(৯১.২)
মোট	**৫৪.১**	**৩৪২.৬**	**৩৯৬.৮**
	(১৩.৬)	**(৮৬.৩)**	**১০০**
	২০০৪-'০৫		
	সংগঠিত	**অসংগঠিত**	**মোট**
সংগঠিত	৩২.০৬	১.৩৫	৩৩.৪১
	(৫২)	(০.৩)	(৭.৩০)
অসংগঠিত	২৯.৫৪	৩৯৬.৬৬	৪২৬.২
	(৪৮)	(৯৯.৭)	(৯২.৭)
মোট	**৬১.৬১**	**৩৯৮.০১**	**৪৫৯.৬১**
	(১৩)	**(৮৭)**	**১০০**
	২০১১-'১২		
	সংগঠিত	**অসংগঠিত**	**মোট**
সংগঠিত	৩৭.১৮	১.৩৯	৩৮.৫৬
	(৪৫.৪)	(০.৪)	(৮.১)
অসংগঠিত	৪৪.৭৪	৩৯০.৯২	৪৩৫.৬৬
	(৫৪.৬)	(৯৯.৬)	(৯১.৯)
মোট	**৮১.৯২**	**৩৯২.৩১**	**৪৭৪.২৩**
	(১৭.৩)	**(৮২.৭)**	**১০০**

সূত্র : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার ইউনিট স্তরের তথ্য ব্যবহার করে ১৯৯৯-২০০০, ২০০৪-'০৫ ও ২০১১-'১২-এ কর্মসংস্থান-বেকারি সমীক্ষা

দেখা যায় কর্মীকুলের অধিকাংশ নিরক্ষর। পেশাগত কুশলতা অত্যন্ত নিচুমানের। ফলে কৃষি থেকে কলকারখানা বা পরিষেবা ক্ষেত্রে তাদের চলে আসাটা মুখের কথা নয়। শ্রমের বাজারে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটায় কৃষি থেকে শ্রমিকরা যাচ্ছে কম বা অদক্ষ হলেও চলে নির্মাণ ক্ষেত্রে, প্রাইভেট গাড়ির চালক, ঘর-গেরস্থালির কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষীর মত কাজে। কমিটি ও কমিশনগুলি শ্রম আইন সংস্কার, দক্ষতা বৃদ্ধি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে জোর দিয়েছে।

নীতি পদক্ষেপ

কম দক্ষতার অন্যতম ক্ষেত্র নির্মাণ। এক্ষেত্রে, কর্মীদের মজুরি নির্ধারণ, কাজের শর্তাবলি, সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির জন্য ১৯৯৬-এ দু'টি আইন তৈরি হয়েছে। অসংগঠিত কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের বন্দোবস্ত করতে ২০০৮-এ প্রণীত হয়েছে অসংগঠিত কর্মী সামাজিক নিরাপত্তা আইন। এছাড়া কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ২০০৮-এ চালু হয় রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের চিকিৎসাপাতির খরচ মেটানো এই বিমার লক্ষ্য। এই যোজনার আওতায় পড়ে বিভিন্ন শ্রেণির অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, যেমন—ঘরবাড়ি ও নির্মাণ কর্মী, রেলের কুলি, রাস্তার হকার, বাড়ির কাজকর্মের লোক, অটো-ট্যাকসি ও রিকশা

চালক, বিড়ি শ্রমিক, খনি কর্মী। ২০১৬-র ৩১ মার্চ ইস্তক, এই বিমা যোজনায় স্মার্ট কার্ড প্রাপকের সংখ্যা ছিল ৪১ কোটি ৩০ লক্ষ।

চুক্তি শ্রমিকের কর্মসংস্থান সুবিন্যস্ত করতে ১৯৭০-এ তৈরি হয় চুক্তি শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও রদ) আইন। তবে কি না এ আইন ২০ জনের বেশি কর্মী নিয়োগকারী সংস্থা বা ঠিকেদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বহু সংখ্যক চুক্তি কর্মী এর আওতায় পড়ে না। এক রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে কাজকাম জোটানো শ্রমিকের চাকরি ও তার শর্তাবলি ঠিক করার জন্য আইন তৈরি হয় ১৯৭৯-তে। অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের জন্য এই আইনে কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে আছে স্থানীয় কর্মীদের সমান মজুরি, মজুরি না খুইয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নিজের রাজ্যে ঘুরে আসার অধিকার, কর্মস্থানে চিকিৎসা ও আবাসনের অধিকার ইত্যাদি। তবে এসবই খাতা-কলমে, বাস্তবে এগুলি সবার নজর এড়িয়ে যায়। ভিন রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকরা থাকে যে তিমিরে সে তিমিরেই।[১] সিনেমা কর্মী, খনি শ্রমিক, বিড়ি ও চুরুট শ্রমিক, ঝাড়ুদার ও ধাঙড়ের মতো পেশার লোকজনের জন্য আছে নানা ধরনের কল্যাণ আইন। কিন্তু এসব নিয়মবিধি সম্পর্কে কর্মীরা ওয়াকিবহাল না থাকায় এবং অদক্ষ শ্রমিকের জোগান চাহিদার তুলনায় বেশি হওয়ায় দর কষাকষির অক্ষমতা হেতু অসংগঠিত শ্রমিকের হাল নিদারুণ করুণ।

সরকার সব অসংগঠিত কর্মীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাকল্পে চালু করেছে নানাবিধ কর্মসূচি। অটল পেনসন যোজনায় অংশগ্রহণকারী ১৮-৪০ বছর বয়সিরা ৬০ বছর বয়স পেরোলে তাদের দেওয়া চাঁদার ভিত্তিতে মাসে কমপক্ষে ১০০০ টাকা পেনসন পাবে। বার্ষিক মাত্র ১২ টাকা প্রিমিয়াম বা কিস্তির বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনায় দুর্ঘটনা এবং অক্ষমতার দরুন মিলবে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ।

সারণি-২
কর্মী সংখ্যার ভিত্তিতে সংস্থার শ্রেণিভাগ

(শতাংশে)

ক্রমিক সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	দফা	অর্থনৈতিক সুমারি সাল			
			১৯৯০	১৯৯৮	২০০৫	২০১৩
১	১-৫	সংস্থা	৯৩.৪	৯৪.০	৯৫.৪	৯৫.৫
		কর্মসংস্থান	৫৪.৫	৫৮.৬	৬৭.৩	৬৯.৫
২	৬-৯	সংস্থা	৩.৫	৩.৩	৩.৪	৩.১
		কর্মসংস্থান	৮.৪	৮.৩	১০.৩	৯.৩
৩	১০ ও তার বেশি	সংস্থা	৩.১	২.৮	১.৩	১.৪
		কর্মসংস্থান	৩৭.১	৩৩.১	২২.৪	২১.২

উৎস : ৫ম ও ৬ষ্ঠ অর্থনৈতিক সুমারি—নিখিল ভারত প্রতিবেদন

বছরে ৩৩০ টাকার কিস্তি দিলে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনায় থাকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত। এছাড়া আছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। শস্য বোনার আগে থেকে শুরু করে ফসল তোলার পর অবধি অপ্রত্যাশিত দুর্বিপাকে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে এই যোজনায় আর্থিক সাহায্য করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনায়, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা কর্মী ভবিষ্য-নিধিতে নিয়োগকর্তার দেয় চাঁদার ৮.৩৩ শতাংশ সরকার মেটায়। বস্ত্র ক্ষেত্রে ২০১৬-র এপ্রিলের পর খোলা সব নতুন অ্যাকাউন্টের জন্য নিয়োগকর্তার দেয় পুরো ১২ শতাংশ চাঁদাই সরকার বহন করবে। বেশি কর্মী নিয়োগ ও তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ছোটো সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া এই যোজনার লক্ষ্য। অ্যাপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবিশদের নিতে নিয়োগকারীকে প্রণোদিত করার জন্য চালু হয়েছে জাতীয় শিক্ষানবিশ বিকাশ কর্মসূচি। এই কর্মসূচি মারফত সরকার শিক্ষানবিশকে দেওয়া বৃত্তির ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ব্যয় পূরণের সর্বোচ্চ সীমা শিক্ষানবিশপিছু মাসিক ১৫০০ টাকা। এছাড়া প্রশিক্ষণ খরচ বাবদ সরকার সদ্য নিযুক্ত শিক্ষানবিশপিছু ৫০০ ঘণ্টা বা ৩ মাসের জন্য ৭৫০০ টাকা বরাদ্দ করে।

স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে ২০-টির বেশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। শ্রমের বাজারে নতুন ঢোকা কর্মীরা যাতে দক্ষ হয়ে বেশি মাইনেকড়ির কাজ জোটাতে পারে সেটাই এর লক্ষ্য।

স্বচ্ছন্দে ব্যবসা করার উদ্যোগে (ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ) রেজিস্ট্রি, শ্রম আইন মান্যতা, তদারকি বা পরিদর্শন-এর প্রক্রিয়া সহজ-সরল করা হয়েছে। আরও বেশি সংস্থা গড়ে তোলা এবং ভালো কর্মসংস্থানে উৎসাহ জোগানো এর উদ্দেশ্য। 'ভারতে বানাও', ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো প্রধান প্রধান কর্মসূচি মারফত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া উচিত। এছাড়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, মুদ্রা, অ্যাসপায়ার, অটল ইনোভেশন মিশন, প্রধানমন্ত্রী যুব যোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্যোগ বিকাশের প্রচেষ্টা চলছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব কর্মসূচি মারফত উঠে আসা উদ্যোগীদের মাধ্যমে আরও কাজ সৃষ্টি করা।

শেষে এককথায় বলতে হয়, আইন ও কর্মসূচি আরও বেশি অসংগঠিত কর্মীকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনবে। এর পাশাপাশি, দেখা দরকার যে, নতুন কর্মসংস্থান যেন হয় উন্নত মানের।❑

(লেখক নীতি আয়োগের 'দক্ষতা বিকাশ ও কর্মসংস্থান ইউনিট'-এর নির্দেশক। ইমেল : srija.a@nic.in)

১ ইন্টারনাল লেবার মাইগ্রেশন ইন ইন্ডিয়া রেইজেস ইন্টিগ্রেশন চ্যালেঞ্জেস ফর মাইগ্রান্টস; রামিজ আব্বাস ও দিব্য বর্মা, মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট, মার্চ ২০১৪

WBCS কাউকে খালি হাতে ফেরায় না

বিশ্বায়নের ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির দরজা খুলে গেছে। বহুজাতিক কোম্পানী গুলিতে অর্থ এবং গ্ল্যামার থাকলেও তারুণ্যকে নিংড়ে নেয়। সরকারি চাকরিতে রয়েছে মর্যাদা, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা। বেতনও যথেষ্ট হ্যান্ডস্যাম। সরকারি চাকরিতে রয়েছে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। রয়েছে যথেষ্ট ছুটিছাটাও। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে সবচেয়ে সেরা চাকরী হল সরকারি চাকরি। পরিসংখ্যান বলছে গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েরা ইংরাজিতে একটু দুর্বল হয়। তাদের ক্ষেত্রে পি.এস.সি পরিচালিত পরীক্ষাগুলিকেই টার্গেট করা উচিত, কেন্দ্রীয় সরকারের (যেমন এসএসসি, সি ডি এস, রেল, ব্যাঙ্ক) চাকরির পরীক্ষায় প্রার্থীকে ইংরাজি ও অঙ্কে পারদর্শী হতে হয়। এখন স্পেশ্যালাইজেশনের যুগ। তাই একটি বিষয় নিয়েই লেগে থাকা ভালো। পি.এস.সি সাধারণত প্রতি বছর নিয়মিতভাবে দশম শ্রেণি উত্তীর্ণদের জন্য ক্লার্কশিপ পরীক্ষা নেয়। তাছাড়া গ্র্যাজুয়েটদের জন্য রয়েছে এস.আই (পুলিশ) এবং ডব্লুবিসিএস। ওয়েস্টবেঙ্গল এস এস সি নিয়মিত ভাবে ক্লার্ক, গ্রুপ-ডি, এবং গ্রুপ - বি অফিসার নিয়োগ করে থাকে। অপরদিকে স্কুল সার্ভিস এবং প্রাইমারী টেট পরীক্ষা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। তার ওপর রয়েছে কোর্ট কেসের ঝামেলা। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে সরকারি চাকরির সমতুল্য নয় আর কোন চাকরিই। তাই অল্প শ্রম এবং সময়ে চাকরি পাওয়ার লক্ষ্য থাকলে টার্গেট করা উচিত WBCS কেই।

WBCS - 2018 ব্যাচে ভর্তি চলছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ডব্লুবিসিএস-ই হল একমাত্র পরীক্ষা যেটি প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রিতা ডব্লুবিসিএস-এ আর নেই, এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে সম্পূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতি। সুতরাং গ্র্যাজুয়েশনের পর চার বছর ধরে মাস্টার্স—বিএড করে স্কুল সার্ভিসের অপেক্ষায় না থেকে ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতিতে নেমে পড়া শুধু ভালোই নয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ডব্লুবিসিএস-এর সিলেবাসে সম্প্রতি সরলীকরণ ঘটেছে, MCQ প্রশ্নের প্রবেশ ঘটেছে মেনসেও। সিলেবাসের এরূপ পুনর্বিন্যাসের ফলে ডব্লুবিসিএস-এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অন্যান্য পরীক্ষাগুলিতেও সাফল্য পাওয়া যাবে একই প্রস্তুতিতে। অপশনালের বোঝাও লাঘব হয়েছে অনেকটা। A/B গ্রুপের জন্য বর্তমানে নিতে হয় একটি অপশনাল। C/D গ্রুপের কোন অপশনালই নেই। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ডব্লুবিসিএস-এর ক্ষেত্রে 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর কাজ করছে। আর যারা এই পরীক্ষাকেই টার্গেট করছে তাদের সামনে রয়েছে 'Win-Win Situation'।

ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য **অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন** যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলছে। **এই প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র ব্রাঞ্চ থেকে WBCS-2014-এর চূড়ান্ত তালিকায় সফল হয়েছে ১২০ জন ও WBCS-2013-তে সফল হয়েছে ১১০ জন এবং মিসলেনিয়াস ২০১১-তে ৬৫ জন সফল। সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সংস্থা। WBCS - 2015 তে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এই প্রতিষ্ঠানের।**

এরকম অকল্পনীয় সাফল্যের পিছনে দুটি ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক, কোর্সটি কনসিভ, ডিজাইন করা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং-স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন—সম্পূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন ডব্লুবিসিএস অফিসারদের একটি ডেডিকেটেড টিম। বেশির ভাগ ক্লাসই নেন তাহারা।

২০১৮ কে স্বপ্ন পূরণের টার্গেট করতে চাইলে এখনই করা দরকার 'শুরুর মতো শুরু'। বাড়িতে খাপছাড়া প্রস্তুতি নয়, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের এক্সপার্ট গাইডেন্সের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকুক প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞ। একাগ্রচিত্তে তোমাদের ঐকান্তিক পরিশ্রম আর আমাদের যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত গাইডেন্স—এই দুই-এর সঠিক মেলবন্ধনে আসবে তোমাদের বহুকাঙ্খিত জয়। এ জয় একান্ত তোমাদের জয়, তোমাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার জয়।

নিখরচায় রাজ্যব্যাপী কেরিয়ার কাউন্সেলিং

আপনার কলেজের থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা কি সবে শেষ হয়েছে? ভবিষ্যতে কী করবেন তা নিয়ে কি দ্বিধাগ্রস্ত? কোন ধরনের চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না? নাকি কয়েক বছর আগে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর বসে আছেন। এখনও কোনো সরকারি চাকরি জোটেনি? মনে রাখবেন, সব চাকরি সকলের জন্য নয়। কেউ অঙ্কে দুর্বল, কেউ ইংরেজিতে কাঁচা, কারও মেধা আবার সাধারণ মানের। কে কোন চাকরির পরীক্ষাতে সহজে সাফল্য পেতে পারে, সে জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কেরিয়ার কাউন্সেলিং করা দরকার। দক্ষ কাউন্সেলররা আপনাদের শক্তি, সামর্থ্য ও দুর্বলতা বিবেচনা করে বাতলে দেবেন কোন পথে এগোলে অতি সহজেই সাফল্য পাবেন। বেকার ছেলেমেয়েদের নিজের জীবনদর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চাকরির হদিশ দিতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ফ্রি সেমিনারের আয়োজন করেছে। কাউন্সেলর হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সামিম সরকার ও অন্যান্য WBCS অফিসারেরা। সেমিনারগুলি হবে এপ্রিল ও মে মাসে নিচের শহরগুলিতে। নিখরচায় যোগদান করতে সংশ্লিষ্ট নম্বরে ফোন করে নাম নথিভুক্ত করুন।

● কলেজস্ট্রীট-8599955633 ● বহরমপুর-9474582569 ● শিলিগুড়ি-9474764635 ● বারাসাত-9800946498
● উলুবেড়িয়া-9051392240 ● পার্কসার্কাস-8170828971 ● সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-9932105605

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

9038786000
9674478644

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

Website : www.academicassociation.in ✸ Uluberia-9051392240 ✸ Barasat-9800946498
✸ Berhampur-9474582569 ✸ Siliguri-9474764635 ✸ Birati-9674447451 ✸ Medinipur Town-9474736230

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

শ্রম নীতি ও শ্রমিক-কল্যাণ : আন্তর্জাতিক চিত্রের সঙ্গে তুলনা

*ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে বিপুল সংখ্যক বেকার ও আধা-বেকারের কর্মসংস্থান এখনও বাকি, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে কল্যাণমূলক দিকটির ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য যে সুরক্ষামূলক শ্রম আইন রয়েছে, তা এককথায় বিশ্বের প্রথম সারির এবং বেকার সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে এমন সমস্ত উন্নত দেশেও এই ধরনের সুরক্ষাকবচযুক্ত আইন চোখে পড়ে না। এইভাবেই ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদের শিক্ষানবিশির (সাধারণত এক বছর বা তারও কম) পর স্থায়ী কর্মনিযুক্তির পথ গড়ে উঠেছে। একশোর বেশি কর্মীবিশিষ্ট সংস্থায় সরকারের অনুমতি ছাড়া কর্মী ছাঁটাই করা যায় না। সংস্থা অলাভজনক, রুগ্ন হয়ে পড়লেও কর্মী ছাঁটাইয়ের অনুমতি খুব কম ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে (কারণ কোনও রাজনৈতিক নেতাই এ দেশের সুসংগঠিত কর্মী সংগঠনগুলির রোষে পড়তে চান না)। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের বেলায় কর্মদক্ষতা নির্বিশেষে বছরে নির্দিষ্ট অংকের বেতন বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এতে কঠোর পরিশ্রম করা বা নিজেদের কর্মদক্ষতা আরও বাড়ানোর উৎসাহটাই চলে যায়। এর ফলেই উৎপাদনশীলতা হ্রাস, পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, রপ্তানিতে মন্দা এবং তা থেকেই কালক্রমে বেতন ছাঁটাই, কাজের সুযোগ হ্রাস এবং লাগামছাড়া বেকারত্ব। আমাদের যা উন্নয়নের হার এবং আমাদের সামনে যে লক্ষ লক্ষ কর্মপ্রার্থী তরুণ-তরুণীর ভিড় সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার সঙ্গে আপোস করে এতটা সুরক্ষার বন্দোবস্ত কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। লিখছেন—***প্রদীপ আগরওয়াল***

একটি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সে দেশের শ্রম সম্পদের দক্ষ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের বিষয়টিতে আলাদা করে বিবেচনা করা দরকার। কারণ শ্রমিকরা কোনও পণ্য সামগ্রী নয়, তারা মানুষ। তাই শ্রম নীতিগুলির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, তাদের কল্যাণের দিকটি গুরুত্ব পাওয়া দরকার। মূলত এই কারণেই শ্রম বাজারের নীতি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এর মধ্যে যারা শ্রমিক-কল্যাণ বা সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থার পক্ষে তারা প্রায়শই কর্মী সংগঠন বা ইউনিয়ন গড়ে তোলার স্বাধীনতা, ন্যূনতম মজুরি আইন, কাজের খানিকটা নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা, বেকারত্ব বিমা, বা ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে নতুন করে প্রশিক্ষণের জন্য ভরতুকিতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে সওয়াল করে থাকেন (উদাহরণের জন্য দেখুন : স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড টোকম্যান, ১৯৯১; আইএলও, ১৯৯০; ভাদুড়ি, ১৯৯৬)। অন্যদিকে শ্রম বাজারগুলিকে আরও দক্ষ করে তোলার কথা যারা বলেন তাদের মতে, কাজের নিরাপত্তার নামে রাষ্ট্রের যে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ আদতে কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা এবং বিকাশের হারই কমাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে শ্রমিকদের স্বার্থই বিপন্ন হবে (উদাহরণের জন্য দেখুন, ক্রুয়েজার, ১৯৭৪ [Krueger, 1974]; ওলসন, ১৯৮২; লাজিয়ার, ১৯৯০; ফ্যালন এবং লুকাস, ১৯৯১ এবং ১৯৯৩)।

তারা নীতিগুলির সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন।

(১) কাজের জন্য একটা উৎসাহমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে শ্রমকে যথাসম্ভব উৎপাদনশীল করে তোলা। অর্থাৎ, বেতন, বোনাস, পদোন্নতির একটি নীতি গড়ে তোলা যেখানে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মূল্য থাকবে।

(২) শ্রমিক ও মালিক পক্ষের বিবাদ নিরসনের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গঠনের মাধ্যমে একটা সৌজন্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা; যাতে বন্‌ধ, হরতাল ইত্যাদির দরুন মূল্যবান কর্ম দিবসের অপচয় যতটা সম্ভব কমানো যায়।

(৩) অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন ধাক্কা আরও ভালোভাবে সামাল দেওয়া বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে তাতে হঠাৎ করে আসা পরিবর্তন-এর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ইত্যাদি আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য শ্রমের ব্যবহারে নমনীয়তা রাখা, যেমন—সহজে ছাঁটাই এবং শ্রমিকদের নতুন করে প্রশিক্ষণের সংস্থান।

(৪) শ্রম বাজারে হস্তক্ষেপ বা শ্রম বাজারের অদল-বদল যতটা সম্ভব কম করা।

বাস্তবে এই দুই পরস্পর বিরোধী মতামতই গুরুত্বপূর্ণ এবং দু'টির মধ্যে একটি পথ বেছে নিলেই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। বরং এই দু'টি বিরোধী মতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। এই কারণেই বেশিরভাগ দেশই এমন কিছু শ্রম নীতি বেছে নিয়েছে যা এই দুই চরমপন্থী মতের মাঝামাঝি একটা মধ্যম পন্থা অনুসরণ করছে। তাছাড়া কোনও একটি দেশের উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি বা বেকারত্বের হারের ওপরও এই শ্রম নীতি নির্ধারণের বিষয়টা কিছুটা নির্ভর করে। একটি উন্নত দেশ যখন প্রায় একশো শতাংশ কর্মসংস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন সেই দেশ অনেক বেশি

করে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতেই পারে।

কারণ তখন রাষ্ট্রকে অল্প সংখ্যক শ্রমিকেরই দায়-দায়িত্ব নিতে হয়, যাদের হয় তো কর্মসংস্থান হয়নি। কিন্তু শিল্পায়নের একেবারে প্রাথমিক পর্বে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দেশে, বিশেষত, যেখানে জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশই কর্মহীন বা কর্মসংস্থান হয়ে থাকলেও তা লাভজনক নয়, সেখানে দক্ষতার ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। একইভাবে যে দেশগুলি মুক্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী এবং যেখানে অর্থনীতি মূলত রপ্তানি এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি-নির্ভর, সেখানকার রপ্তানি বাজারগুলিকে প্রতিযোগিতা এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি টানার কথা মাথায় রেখে শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত চিনও এমন সব শ্রম নীতি গ্রহণ করেছে যা শ্রমের দক্ষ ও উৎপাদনশীল ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। অথচ, শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার্থেই একদিন গড়ে উঠেছিল চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। চিনের শ্রম নীতি অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের (অথবা 'স্থায়ী') কাজের মেয়াদ সত্ত্বেও শ্রম সংক্রান্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা বা কর্মী বিষয়ক নিয়ম-কানুনের গুরুতর লঙ্ঘন, কর্তব্যে ব্যাপক অবহেলা বা অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্য সেই কাজের মেয়াদ শেষ করে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে। এই নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যে সমস্ত কর্মীর পুনর্নিয়োগ হয় না, তাদের বরখাস্ত-ভাতা বা অন্য কোনও রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সংস্থান নেই। উৎপাদন বা সংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ কোনও বড়োসড়ো সমস্যার (যেমন—বড়ো ধরনের পুনর্বিন্যাস, ব্যবসা বা রপ্তানির বাজার মার খাওয়ার কারণে উৎপাদনে বিশাল হ্রাস) মুখে পড়লে এক সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অনুমোদন রয়েছে।

তবে এই ধরনের ছাঁটাইয়ের অন্তত এক মাস আগে নোটিশ দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে চাকরির প্রতিটি বছরের জন্য এক মাসের করে বেতন বরখাস্ত ভাতা হিসাবে দিতে হবে। এছাড়া নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন বা গুরুতর অন্য কোনও অভিযোগ ব্যতীত যে সমস্ত ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে বরখাস্ত ভাতা দেওয়া প্রয়োজন। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে শ্রম আইন আরও বেশি নমনীয়। এই সমস্ত অঞ্চলে নিয়োগকর্তাদের হাতেই নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকে। প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি টানার তাগিদ এবং সেই সঙ্গে রপ্তানির ক্ষেত্রে সর্বদা অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনশীল পরিবেশের ফলেই উৎপাদনের দিকটিতে অনেক বেশি নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন। আর এই ধরনের নীতি শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের নীতিই প্রায় এক। তবে দেশভেদে আইনের খুঁটিনাটি দিকগুলিতে হয়তো কিছুটা হেরফের রয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ দেশই তাদের অর্থনীতি মজবুত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শ্রম আইনগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। বর্তমানে এই দেশগুলিতে একজন কর্মী যতদিন কাজ করেছেন তার প্রত্যেকটি বছরের (বা তার অংশ) জন্য এক মাসের করে বেতন বরখাস্ত ভাতা হিসাবে দিতে হয় এবং তার কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনটিতেই এই পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়। তবে কাজের মেয়াদ যাই হোক না কেন (ধরা যাক ২০ বছর) সর্বোচ্চ ৮ থেকে ১২ মাসের বেতনই দিতে হয় এই সমস্ত ক্ষেত্রে। সিঙ্গাপুরের কোনও সংস্থায় একজন কর্মীর কাজের মেয়াদ ৩ বছরের কম হলে বা তিনি পরিচালক গোষ্ঠীর (ম্যানেজারিয়ান পোজিশন) মধ্যে থাকলে বরখাস্ত ভাতা দেওয়া হয় না।

"পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই বড়ো অংকের বোনাস দেওয়ার একটা প্রথা রয়েছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কয়েক মাসের বেতনের সমান। তবে এই বোনাসের কোনও নির্দিষ্ট অংক নেই। সংস্থাগুলির লাভ তো বটেই, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কর্মীদের কাজকর্মের মূল্যায়নের ওপরই এই বোনাসের অংকটা নির্ভর করে। এতে কর্মীদের তরফে সহযোগিতামূলক আচরণ যেমন সুনিশ্চিত করা যা, তেমনই দক্ষ ও মসৃণভাবে সংস্থা পরিচালনা সহজতর হয়।"

পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই বড়ো অংকের বোনাস দেওয়ার একটা প্রথা রয়েছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কয়েক মাসের বেতনের সমান। তবে এই বোনাসের কোনও নির্দিষ্ট অংক নেই। সংস্থাগুলির লাভ তো বটেই, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কর্মীদের কাজকর্মের মূল্যায়নের ওপরই এই বোনাসের অংকটা নির্ভর করে। এতে কর্মীদের তরফে সহযোগিতামূলক আচরণ যেমন সুনিশ্চিত করা যা, তেমনই দক্ষ ও মসৃণভাবে সংস্থা পরিচালনা সহজতর হয়।

ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই অনুরূপ আইন চালু রয়েছে (ইউরোপে যে শ্রমিক সুরক্ষা নীতির জন্ম তা থেকেই বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে পূর্ব এশিয়ার আইনগুলি গ্রহণ করা হয়েছে)। তবে ইউরোপের দেশগুলি অনেক উন্নত এবং বেকারত্ব নিয়ে ততটা সমস্যাও নেই সেখানে। এই কারণেই ওই সমস্ত দেশের শ্রম আইনগুলিতে কর্মীদের স্বার্থরক্ষায় একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; যদিও বেশিরভাগ দেশেই শৃঙ্খলাভঙ্গ বা অদক্ষতা কিংবা সংস্থা চালনার ক্ষেত্রে কোনও গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে যেখানে উৎপাদন কমানো অত্যন্ত আবশ্যক, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে

ছাঁটাইয়ের অনুমোদন রয়েছে। যে গ্রেট ব্রিটেনের আইন অনুসরণে ঊনিশ শতকে ভারতের শ্রম আইনগুলির জন্ম, সেখানকার অন্যান্য বরখাস্ত আইনের সংস্থান অনুযায়ী, কোনও নিয়োগকর্তা একজন কর্মীকে একমাত্র তখনই বরখাস্ত করতে পারবেন যদি—

(১) বরখাস্ত করার মতো কোনও ন্যায্য কারণ থাকে; এবং

(২) যদি তা 'নিরপেক্ষ' এবং 'যুক্তিসঙ্গত' প্রক্রিয়া মেনে হয়।

এই আইনের বিধান অনুযায়ী পাঁচটি কারণকে 'ন্যায্য' কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে। যেমন—

(১) উদ্বৃত্ত কর্মী (যেখানে নিয়োগকর্তা একটি বিশেষ ভূমিকায় এবং/অথবা একটি বিশেষ স্থানে কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে থাকেন);

(২) অসদাচরণ;

(৩) সামর্থ্য (যেমন—কাজকর্মের অদক্ষতা বা কোনও কাজ করার অক্ষমতা);

(৪) যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তিকে কাজে বহাল রাখলে আইনি কর্তব্যের ত্রুটি হতে পারে (যেমন—অযোগ্য বলে ঘোষিত কোনও ড্রাইভারকে গাড়ি চালানোর কাজে মোতায়েন রাখা);

(৫) উপযুক্ত অন্যান্য কারণ, যেগুলির আওতায় সকলেই আসতেই পারেন।

গ্রেট ব্রিটেন-সহ ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি শেষ হওয়াকেই ছাঁটাই বলে গণ্য করা হয়। তবে গ্রেট ব্রিটেনে সংশ্লিষ্ট কর্মী যতদিন কাজ করেছেন তার প্রতিটি বছরের জন্য প্রায় এক সপ্তাহের বেতন ধরে বরখাস্ত ভাতা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রেও এই বরখাস্ত ভাতার সর্বোচ্চ সীমা তিন মাসের বেতন। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যথেষ্ট উন্নত এবং উচ্চ আয়সম্পন্ন। এই দেশগুলিতে সামাজিক সুরক্ষার উন্নত ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং সেখানে বেকারদের জন্যও যথেষ্ট অর্থ প্রদান করা হয়। ভারতে যেখানে একশোর বেশি কর্মীবিশিষ্ট যে কোনও সংস্থার ক্ষেত্রেই একজন কর্মী ছাঁটাইয়ের জন্যও সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় (কর্মী সংগঠনগুলির রোষের মুখে পড়ার ভয়ে যা কোনও বিবেচনাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলই দিতে চায় না) সেখানে ওই সমস্ত দেশে

"পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে শ্রম আইনগুলি সাধারণভাবে শ্রমের দক্ষ ও নমনীয় ব্যবহারের পক্ষে সহায়ক। বেশিরভাগ দেশেই আইনের সাহায্যে একটি শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে আইনের বিধান অনুযায়ী কোনও ধর্মঘট ডাকার আগে বিবাদ নিরসনের একটা সুযোগ হিসাবে দু' পক্ষকে একটি নির্দিষ্ট সময় (প্রায় এক মাস) দেওয়া হয়। ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক সালিশির মাধ্যমে এই বিবাদ নিরসনের ব্যবস্থাও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে। ফলে ওই দেশগুলিতে ধর্মঘট, হরতাল বা কর্মবিরতির মতো ঘটনা সচরাচর ঘটে না।"

আদালতে শুধু এই যুক্তি পেশ করলেই চলে যে দেশের আইন মেনেই এই ছাঁটাই।

আমেরিকার শ্রম আইন অনুযায়ী, শ্রমিক সংগঠনের সুনির্দিষ্ট চুক্তি বা এই চুক্তির শর্তগুলিকে মেনে চলার বাধ্যবাধকতা না থাকলে নিয়োগকর্তারা তাদের ইচ্ছে মতো শ্রমিক ছাঁটাই (বরখাস্ত ভাতা বা কোনও রকম ক্ষতিপূরণ ছাড়াই) করতে পারেন। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, সে দেশে অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা রয়েছে, যার আওতায় কর্মহীন শ্রমিকদের এক বছর পর্যন্ত বেকারভাতা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন থাকলে তারও ব্যবস্থা করা হয়।

এর ঠিক বিপরীত অবস্থানে থাকা জাপানে শ্রম আইনগুলি অত্যন্ত কঠোর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশ গঠনের সময় জাপান সরকারের তরফে সংস্থাগুলির ওপর যে চাপ দেওয়া হয়েছিল খানিকটা সেই কারণেই কোনও একটি সংস্থার সঙ্গে সারা জীবন কাজ করার এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে জাপানের বাসিন্দাদের মধ্যে। কিছুটা ঐতিহ্য আর খানিকটা কঠোর আইন-কানুনের চাপে ছাঁটাইয়ের ঘটনা জাপানে খুব বিরল। তবে স্থায়ী কর্মনিয়োগ সত্ত্বেও শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার একটা পথ খুঁজে নিয়েছে সে দেশের মানুষ। এজন্য কর্মীদের একটা বড়ো অংকের একটা বোনাস দেওয়া হয়, যা প্রায়শই ৩-৪ মাসের বেতনের সমতুল এবং এই বোনাসের অংকটা নির্ভর করে সংস্থার লাভ তথা ব্যক্তিগতভাবে কোনও কর্মীর কর্মদক্ষতার ওপর। এর ফলে সংস্থার লাভের ওপর কর্মীদের একটা অংশীদারিত্ব যেমন সুনিশ্চিত করা যায়, তেমনই কর্মীবাহিনী তথা সমগ্র সংস্থার কাজকর্ম আরও দক্ষভাবে পরিচালনাও করা যায়।

ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে বিপুল সংখ্যক বেকার ও আধা-বেকারের কর্মসংস্থান এখনও বাকি, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে কল্যাণমূলক দিকটির ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য যে সুরক্ষামূলক শ্রম আইন রয়েছে, তা এককথায় বিশ্বের প্রথম সারির এবং বেকার সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে এমন সমস্ত উন্নত দেশেও এই ধরনের সুরক্ষাকবচযুক্ত আইন চোখে পড়ে না। এইভাবেই ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদের শিক্ষানবিশির (সাধারণত এক বছর বা তারও কম) পর স্থায়ী কর্মনিযুক্তির পথ গড়ে উঠেছে। একশোর বেশি কর্মীবিশিষ্ট সংস্থায় সরকারের অনুমতি ছাড়া কর্মী ছাঁটাই করা যায় না। সংস্থা অলাভজনক, রুগ্ন হয়ে পড়লেও কর্মী ছাঁটাইয়ের অনুমতি খুব কম ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে (কারণ কোনও রাজনৈতিক নেতাই এ দেশের সুসংগঠিত কর্মী সংগঠনগুলির রোষে পড়তে চান না)।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের বেলায় কর্মদক্ষতা নির্বিশেষে বছরে নির্দিষ্ট অংকের বেতন বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এতে কঠোর পরিশ্রম করা বা নিজেদের কর্মদক্ষতা আরও বাড়ানোর উৎসাহটাই চলে যায়। এর ফলেই উৎপাদনশীলতা হ্রাস, পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, রপ্তানিতে মন্দা এবং তা থেকেই কালক্রমে বেতন ছাঁটাই, কাজের সুযোগ হ্রাস এবং লাগামছাড়া বেকারত্ব।

আমাদের যা উন্নয়নের হার এবং আমাদের সামনে যে লক্ষ লক্ষ কর্মপ্রার্থী তরুণ-তরুণীর ভিড় সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার সঙ্গে আপোস করে এতটা সুরক্ষার বন্দোবস্ত কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। চিন, পূর্ব এশিয়া এবং ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে অত্যধিক সুরক্ষামূলক শ্রম নীতিগুলি আদতে দীর্ঘমেয়াদে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজে লাগে না। বরং, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে, পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করে শ্রমিকদের লাভের চেয়ে তা ক্ষতিই বেশি করে। পণ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়লে তা রপ্তানির বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন বা রপ্তানির বৃদ্ধি যতটা হওয়ার কথা তার চেয়ে কম হয়। এতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দু'টি দিকই মার খায়।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে শ্রম আইনগুলি সাধারণভাবে শ্রমের দক্ষ ও নমনীয় ব্যবহারের পক্ষে সহায়ক। বেশিরভাগ দেশেই আইনের সাহায্যে একটি শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে আইনের বিধান অনুযায়ী কোনও ধর্মঘট ডাকার আগে বিবাদ নিরসনের একটা সুযোগ হিসাবে দু' পক্ষকে একটি নির্দিষ্ট সময় (প্রায় এক মাস) দেওয়া হয়। ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক সালিশির মাধ্যমে এই বিবাদ নিরসনের ব্যবস্থাও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে। ফলে ওই দেশগুলিতে ধর্মঘট, হরতাল বা কর্মবিরতির মতো ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এছাড়াও বরখাস্তের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হলেও (সংস্থায় প্রতিটি বছর কাজের জন্য এক মাসের করে বেতন) সংস্থাগুলি প্রয়োজন মতো কর্মী ছাঁটাই করতে পারে। এর ফলে শ্রমের ব্যবহারে যেমন নমনীয়তা আসে, তেমনই কর্মীরাও অনেক শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। এই ধরনের শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মীদের নিয়োগে শিল্পপতিরাও আগ্রহ দেখান। যার ফলে আরও বেশি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেতন বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হয়।

"কিন্তু ভারতে দক্ষতা ও কল্যাণমূলক দিকটির (বা সুরক্ষা) মধ্যে সঠিক ভারসাম্য কখনও রক্ষাই করা হয়নি এবং দক্ষতার বিষয়টি বরাবরই চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি দক্ষতার বিষয়টিকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছে, ভারতের ভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ততটা দেওয়া সম্ভব না হলেও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্তত যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা জারি রাখা দরকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক পূর্ব এশিয়ার নিম্নোক্ত শ্রম নীতিগুলিকে ভারতে গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতীয় শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের পথটা সুগম হয়।"

জাপানের মতো নমনীয় বেতন ব্যবস্থার আদর্শ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশও অনুসরণ করেছে। কর্মীদের বোনাস দেওয়ার এই প্রথা, যা কি না কিছুটা হলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থার লাভের অংকের ওপর নির্ভরশীল তা কর্মীদের আচার-আচরণকে আরও সহযোগিতাপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে। চাকরির যথেষ্ট নিরাপত্তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কর্মীর বোনাসের অংককে (এবং পদোন্নতি) যদি তার কর্মদক্ষতার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে কাজকর্মের উন্নতির জন্য একটি উৎসাহমূলক পরিবেশ তৈরি করা যাবে— যেমনটা হয়েছে জাপানে। সর্বোপরি পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি অতি দ্রুত তাদের শ্রমিকদের জন্য যে উন্নত মানের সাধারণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পেরেছে তা তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

এইভাবেই চিন ও জাপান-সহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণা, উদ্দীপনায় ভরপুর, নমনীয় এবং সুপ্রশিক্ষিত শ্রমিক কাহিনী গড়ে তুলতে সফল হয়েছে।

কিন্তু ভারতে দক্ষতা ও কল্যাণমূলক দিকটির (বা সুরক্ষা) মধ্যে সঠিক ভারসাম্য কখনও রক্ষাই করা হয়নি এবং দক্ষতার বিষয়টি বরাবরই চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি দক্ষতার বিষয়টিকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছে, ভারতের ভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ততটা দেওয়া সম্ভব না হলেও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্তত যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা জারি রাখা দরকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক পূর্ব এশিয়ার নিম্নোক্ত শ্রম নীতিগুলিকে ভারতে গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতীয় শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের পথটা সুগম হয়।

(১) শ্রমিকদের যে প্রকৃত অর্থেই চাকরির যুক্তিসঙ্গত নিরাপত্তার প্রয়োজন এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েও শ্রমের ব্যবহারে কিছুটা নমনীয়তা রাখা। অলাভজনক সংস্থাগুলি দীর্ঘ দিন সরকারি ভরতুকির ওপর টিকিয়ে রাখা যে কখনই সম্ভব নয় সে কথা পরিষ্কার। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য যে সংস্থাগুলিকে অবশ্যই লোকসংখ্যা কমাতে হবে বা উৎপাদন বন্ধ করতে হবে, কিংবা প্রযুক্তিকে ঢেলে সাজাতে হবে, সেই সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে মানবিকতার সঙ্গে

ছাঁটাইয়ের অনুমতি দিতেই হবে। সেই সঙ্গে, যে সমস্ত কর্মী অভব্য আচরণ করে থাকেন বা কাজে অবহেলা করেন তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার রাস্তা খোলা থাকা উচিত নিয়োগকর্তাদের সামনে। তবে ছাঁটাই প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রুখতে পাল্টা ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালতের সামনে সংশ্লিষ্ট কর্মীর অসদাচরণের প্রমাণ দিতে হবে নিয়োগকর্তাকে এবং অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়ে থাকলে নিয়োগকর্তাকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ বা ওই কর্মীকে পুনর্বহালের (যেমন, মালয়েশিয়ায় হয়ে থাকে) ব্যবস্থা করতে হবে। তবে যে কোনও পরিস্থিতিতেই চাকরির সম্পূর্ণ নিরাপত্তা থাকলে কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে কর্মীদের কাজ করার উৎসাহ ও উৎপাদনশীলতা—দুই-ই কমে যায়।

(২) চাকরির যে সময়সীমার পর কর্মীদের আর সহজে ছাঁটাই করা যায় না, তার মেয়াদ ২৪০ দিন থেকে বাড়িয়ে মোটামুটি তিন বছর করা এবং জাপানের আদলে একটি নমনীয় বেতন কাঠামো, অর্থাৎ, যেখানে কর্মীরাও (শ্রমিক ও পরিচালক গোষ্ঠী উভয়পক্ষই) সংস্থার লাভের অংশ পাবেন এবং কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে পদোন্নতির মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে; তেমন একটি ব্যবস্থার সূচনা নিজেদের আরও দক্ষ করে তোলা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করার ব্যাপারে কর্মীদের উৎসাহ দেবে। ভারতের মতো একটি দেশ যেখানে কর্ম নিরাপত্তার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে সেখানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত ভালো ও রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পথ হতে পারে।

(৩) আরও নমনীয় শ্রম আইন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারি আমরা। যেমন—এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র হতে পারে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলি। কারণ এই অঞ্চলগুলিতে রপ্তানির পরিমাণের মধ্যে তারতম্য যেমন বেশি তেমনই এখানে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার উপযোগী আরও দক্ষ শ্রমিক শ্রেণির প্রয়োজন। এতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার কাজটা অনেক সহজ হবে। এই অঞ্চলগুলিতে অতি দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির যে সুবিধা রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতাভিত্তিক শ্রম আইনকে ঘিরে শ্রমিকশ্রেণি তথা শ্রমিক সংগঠনগুলির আশংকাকে প্রশমিত করা যেতে পারে।

(৪) শ্রমিকদের আরও উৎপাদনশীল করে তুলতে গেলে তাদের জন্য আরও উন্নত মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সমস্ত শিশুর কাছে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ওপর আরও বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। দীর্ঘ সময় ধরে অর্থনীতির বিকাশ হার বজায় রাখার জন্য শিশুদের এই মৌলিক শিক্ষা বিশেষভাবে জরুরি। অনুরূপভাবে শ্রমিকপিছু বস্তুগত মূলধনের (ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল) জোগান বাড়ানোর জন্যও আরও জোরদার প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে সঞ্চয় তথা দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার মতো অনুকূল নীতি ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলিকে যদি ভারতের শ্রমনীতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে তা এ দেশের শ্রম সম্পদের সম্ভাবনা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে। একই সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রম-নিবিড় ও রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন নীতি তথা শ্রম নীতিগুলির সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে আসে দু'টি বিষয়। প্রথমত, দ্রুত কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত, কর্মীদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি। ভারত যেহেতু রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের পথে ইতোমধ্যেই অন্য সমস্ত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছে, তাই এ মুহূর্তে শ্রম নীতি সংস্কারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মীদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ রূপে উদ্যোগী হতে পারে দেশ❑

(লেখক 'Institute of Economic Growth'-এর অর্থনীতির অধ্যাপক ও প্রধান, RBI চেয়ার ইউনিট। ইমেল : pradeep@iegindia.org)

উল্লেখপঞ্জি :

- Agrawal, Pradeep, S. Gokarn, V. Mishra, K. S. Parikh and K. Sen, (1995), *Economic Restructuring in East Aisa and India : Perspectives on Policy Reform,* Macmillan : Basingstoke, UK, and Macmillan India : Delhi.
- Bhaduri, Amit (1996), "Employment, Labour Market Flexibility and Economic Liberalization in India", *Indian Journal of Labour Economics,* 39(1) : 13-22.
- Fallon, Peter R., and Robert Lucas (1991), "The Impact of Changes in Job Security Regulations in India and Zimbabwe." *World Bank Economic Review 5(3) :* 395-413.
- Fallon, Peter R. and R. E. Lucas (1993), "Job Security Regulations and the Dynamic Demand for Industrial Labour in India and Zimbabwe", *Journal of Development Economics,* Vol. 40.
- ILO (International Labour Organisation) (1990), *"Wages, Labour Costs and Their Impact on Adjustment, Employment, Growth."* Governing Body Committee on Employment, GB 248/CE/2/1. Geneva.
- Krueger, Anne (1974), "The Political Economy of the Rent-Seeking Society." *American Economic Review 64(3) :* 291-303.
- Lazear, Edward (199), "Job Security Provisions and Employment." *Quarterly Journal of Economics* 105(3) : 699-726.
- Lucas, R. (1988), "On the Mechanics of Economic Growth", *Journal of Monetary Economics.*
- Mehta S. S. (1995), "Exit Policy and Social Safety Net", *Indian Journal of Labour Economics,* 38(4) : 603-609.
- Olson, Mancur (1982), *The Rise and Decline of Nations : Economic Growth Stagflation and Social Rigidities,* Yale University Press, New Haven, Conn.
- Standing Guy and V. Tokman (1991), *Towards Social Adjustment,* ILO, Geneva.
- World Bank (1993), *The East Asian Miracle,* Oxford University Press, Yew York.

মহিলাদের কর্মনিযুক্তি : আশাই ভরসা

*শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে ইরান, পাকিস্তান, সৌদি আরব-সহ হাতে গোনা মাত্র গুটি কয়েক দেশেই পরিস্থিতি ভারতের থেকে সঙ্গিন। ২০১৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় অংশগ্রহণের এই হার ছিল মাত্রই ৩০.৫ শতাংশ। অধিকাংশ দেশ এবং অঞ্চলে এই হারে যেখানে বৃদ্ধি নজরে পড়ছে; সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে চোখে পড়েছে হ্রাস; সৌজন্যে ভারতে শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের হারের দ্রুতগতিতে পতন। উচ্চ হারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি পর্যায়ে নারী সাক্ষরতার হার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নথিভুক্তির হারে বেশ অনুকূল হাওয়া টের পাওয়া গেলেও মেয়েদের কর্মনিয়োগ কিন্তু এক সমস্যা হিসাবেই রয়ে গেছে। সমান পারিশ্রমিক বিধি, ১৯৭৪ পাস হওয়ার বহু বহু বছর বাদেও পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মজুরির ফারাক এক চরম বাস্তব হিসাবে রয়ে গেছে। সব বয়সী, সব শ্রেণির, সব সম্প্রদায়ের, সব অঞ্চলের মহিলারাই এই বৈষম্যের শিকার। এই বিধির সঠিক রূপায়ণ এক গুরত্বপূর্ণ বিষয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় (ILO, 2017) উঠে এসেছে যে, লিঙ্গের ভিত্তিতে মজুরি/পারিশ্রমিকের বৈষম্যের নিরিখে জঘন্য পরিস্থিতি চাক্ষুষ করা যায় যে সব দেশে তার মধ্যে ভারত অন্যতম। এখানে একই কাজের জন্য পুরুষেরা মহিলাদের থেকে বেশি পারিশ্রমিক পান; কখনও কখনও তা ৩০ শতাংশের গণ্ডিও ছাড়িয়ে যায়। লিখেছেন—***নীতা এন.***

দেশের শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার (Workforce Participation Rate—WPR)-এর নিরিখে বিচার করলে ভারতের অবস্থান বেশ শোচনীয়। এমন কি আফ্রিকার সাহারা সন্নিহিত দেশগুলি তথা মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশের তুলনাতেও ভারতে এই হার কম। দেশের মধ্যেও শ্রমশক্তিতে পুরুষদের অংশগ্রহণের নিরিখে মহিলারা পিছিয়ে বেশ কয়েক যোজন (সূত্র : আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন, ২০১৬)। শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে ইরান, পাকিস্তান, সৌদি আরব-সহ হাতে গোনা মাত্র গুটি কয়েক দেশেই পরিস্থিতি ভারতের থেকে সঙ্গিন। ২০১৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় অংশগ্রহণের এই হার ছিল মাত্রই ৩০.৫ শতাংশ। অধিকাংশ দেশ এবং অঞ্চলে এই হারে যেখানে বৃদ্ধি নজরে পড়ছে; সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে চোখে পড়েছে হ্রাস; সৌজন্যে ভারতে শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের হারের দ্রুতগতিতে পতন। উচ্চ হারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি পর্যায়ে নারী সাক্ষরতার হার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নথিভুক্তির হারে বেশ অনুকূল হাওয়া টের পাওয়া গেলেও মেয়েদের কর্মনিয়োগ কিন্তু এক সমস্যা হিসাবেই রয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মতো বড়ো মাপের গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি চালু করা হয় যে সময়পর্বে তখন বিষয়টি আরও বিশেষভাবে ধাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ২০০৪-০৫'এর ২৮.২ শতাংশ থেকে সটান কমে ২০১১-১২ সালে দাঁড়ায় ২১.৭ শতাংশ; যা কি না বর্তমান সঙ্গিন পরিস্থিতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আর এই পরিমাণ হ্রাসের দৌলতে কর্মশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের হারের নিরিখে ভারতের অবস্থান ২০১০ সালের ৮৩-টি দেশের মধ্যে ৬৮-তম থেকে জায়গা থেকে নেমে ২০১২ সালে হয় ৮৭-টি দেশের মধ্যে ৮৪-তম।

মেয়েদের কর্মনিয়োগের হালহকিকৎ

বিভিন্ন ইস্যু এবং সমস্যার কারণে পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় গলদ রয়ে গেছে গোড়া থেকেই। যার দরুন মেয়েদের কাজের সঠিক তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া কার্যত সম্ভব হয় না। যাই হোক, পুরোনো নথিপত্র মহিলাদের কর্মনিয়োগের গতিপ্রকৃতি এবং ধরনধারণ সম্পর্কে মোটের উপর একটা ছবি তুলে ধরে। ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০০৪-০৫ সাল, এই সময়পর্বের মধ্যে মেয়েদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নিরিখে সামান্য পরিমাণ অগ্রগতি চোখে পড়ে। ব্যতিক্রমী এই বছরটি হল ২০০৪-০৫, যে সময় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বাড়ে প্রায় ৩ শতাংশ। তার পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হ্রাস পেয়েই চলেছে শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার। যা কি না নারী-পুরুষের সমানাধিকারের তত্ত্বের যে কোনও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বেমানান। আরও চিন্তার বিষয়, গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার নাটকীয় মাত্রায় কমেছে; যেখানে শহরের মহিলাদের ক্ষেত্রে তা একই জায়গায় স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে।

কাগজি তত্ত্বগত ভাষ্য অনুযায়ী, অর্থনীতিতে উচ্চহারে প্রকৃত মজুরি মানুষের আয়ের উপর যে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে এবং তার সাথে সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করার সুফল—এই দু'টি বিষয়ই মেয়েদের কর্মনিযুক্তিতে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। যাই হোক, শিক্ষা-জগতে মেয়েদের ক্রমশ আরও বেশি বেশি অন্তর্ভুক্তি বা পারিবারিক প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি-এর কোনওটিই

মেয়েদের কর্মশক্তিতে যোগদানে দুরবস্থার এই ছবিটির ব্যাখ্যা দিতে অপারগ (Kapsos প্রমুখ, ২০১৪)। মহিলাদের একটা বেশ বড়সড় অংশই শ্রমশক্তিতে যোগদান করে উঠতে পারে না নিত্যদিনের গৃহস্থালির কাজের চাপে। অন্যান্য আরও বহু কিছুর সাথে এর আরেকটা অর্থ দাঁড়ায়, পরিচর্যার দায়িদায়িত্ব মহিলাদের উপর বেড়েই চলেছে। এই নিবন্ধে বিভিন্ন পরিসংখ্যান পেশ করতে গিয়ে এমন অনেক মহিলাকে কর্মী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যারা পূর্ণ সময়ের কর্মী নন। মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগের ঘাটতি তো রয়েছেই, পাশাপাশি বহু মহিলাই যে পূর্ণ সময়ের জন্য কাজে যোগ দিতে পারেন না তার মূল কারণ আমাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ঘর-গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজের দায় তাদের উপরই ন্যস্ত। এমন কি ২০১১-১২ সাল পর্যন্তও মোট মহিলা কর্মীদের মধ্যে প্রায় ২২ শতাংশই ছিল এধরনের আংশিক সময়ের কর্মী বা পরিপূরক কর্মী। এধরনের আংশিক সময়ের কর্মী এবং মুখ্য শ্রমিক-কর্মী দুই হিসাবেই মহিলাদের অংশভাক ক্রমশ কমছে; তবে মুখ্য শ্রমিক-কর্মী হিসাবে মহিলাদের কর্মনিযুক্তির ঘাটতি অনেক বেশি চোখে পড়ছে। সামাজিক অবস্থান হিসাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রান্তিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহিলা শ্রমিক-কর্মীর অংশভাক তুলনামূলক ভাবে বেশি। কিন্তু এখন এই পরিসংখ্যান দ্রুত পালটে যাচ্ছে (Neetha, ২০১৪)।

মোটের উপর কর্মনিযুক্তির যে সব বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, তার উপর এক বার চোখ বোলানো যাক। ২০১১-১২ সাল নাগাদ মহিলা শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে ৬২.৩ শতাংশেরই কর্মসংস্থান হ'ত কৃষিক্ষেত্রে; অন্যান্য সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে তাদের মাত্র ২০ শতাংশের কর্মনিয়োগ হ'ত; আর কেবল ১৮ শতাংশের কাজ জুটত পরিষেবা ক্ষেত্রে। পরবর্তী সময়পর্বে মহিলাদের অংশভাক খানিকটা বেড়েছে; মূলত নির্মাণ ক্ষেত্রের দৌলতে। তবে সেখানে কর্মসংস্থানের প্রকৃতি একটা ইস্যু। কৃষিক্ষেত্রে বিবিধ সঙ্কটের জেরে নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে কর্মনিযুক্তিতে জোয়ার আসে। উদারীকরণ পরবর্তী সময় পর্বে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে বাড়বাড়ন্তের দৌলতে নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলির অন্যান্য গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে পাড়ি জমাতে থাকার ঘটনা প্রচুর বেড়ে যায় এবং এর স্পষ্ট প্রামাণ্য নথি মেলে। যে ধরনের নিয়মিত কাজ এরা পায়, যেমন—ইট ভাঁটায়, সেখানে চরম শোষণের অবকাশ রয়েছে। শ্রমিক-কর্মীরা বিভিন্ন ঠিকাদারের অধীনে কাজে যোগ দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ঠিকাদার আগাম টাকা কর্জ দিয়ে পরে বেগার খাটায়। এভাবে এদের জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে পেশা—সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ ঠিকাদারের কুক্ষিগত। এই ক্ষেত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মজুরির পরিবর্তে (স্বামী-স্ত্রী) জুটি হিসাবে কাজ পাওয়ার চলন বেশি।

সারণি-১
কর্মে অংশগ্রহণের হারের গতিপ্রকৃতি, মহিলা ও পুরুষ, UPSS*

সময়পর্ব	মোট		গ্রামাঞ্চল		শহরাঞ্চল	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯৯৩-৯৪	৫৪.৪	২৮.৩	৫৫.৩	৩২.৮	৫২.১	১৫.৫
১৯৯৯-২০০০	৫২.৭	২৫.৪	৫৩.১	২৯.৯	৫১.৮	১৩.৯
২০০৪-০৫	৫৪.৭	২৮.২	৫৪.৬	৩২.৭	৫৪.৯	১৬.৬
২০০৭-০৮	৫৫.০	২৪.৬	৫৪.৮	২৮.৯	৫৫.৪	১৩.৮
২০০৯-১০	৫৪.৬	২২.৫	৫৪.৭	২৬.১	৫৪.৩	১৩.৮
২০১১-১২	৫৪.৪	২১.৭	৫৪.৩	২৪.৮	৫৪.৬	১৪.৭

*Usual Principal and Subsidiary Status(Ministry of Labour.lndla)
সূত্র : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা পরিসংখ্যান, বিভিন্ন দফায়

"মহিলাদের একটা বেশ বড়সড় অংশই শ্রমশক্তিতে যোগদান করে উঠতে পারে না নিত্যদিনের গৃহস্থালির কাজের চাপে। অন্যান্য আরও বহু কিছুর সাথে এর আরেকটা অর্থ দাঁড়ায়, পরিচর্যার দায়িদায়িত্ব মহিলাদের উপর বেড়েই চলেছে। এই নিবন্ধে বিভিন্ন পরিসংখ্যান পেশ করতে গিয়ে এমন অনেক মহিলাকে কর্মী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যারা পূর্ণ সময়ের কর্মী নন। মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগের ঘাটতি তো রয়েছেই, পাশাপাশি বহু মহিলাই যে পূর্ণ সময়ের জন্য কাজে যোগ দিতে পারেন না তার মূল কারণ আমাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ঘর-গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজের দায় তাদের উপরই ন্যস্ত।"

মহিলাদের কর্মসংস্থানের ধরন ও গুণমান

কোন ধরনের কাজে মেয়েরা সাধারণত যুক্ত থাকেন? গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের ক্ষেত্রে বিনা বেতনের কর্মী/সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করেন, এরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ; ৪১ শতাংশের মতো। এর পরে ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কর্মনিযুক্তি ঘটে; এদের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ। কৃষি এবং কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন কাজে সংকট ঘনিয়ে আসায় এসব পেশা ছেড়ে পরিবারের পুরুষরা মজুরি ভিত্তিক কাজের খোঁজে ভিটেমাটি ত্যাগ করে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছেন। পেছনে রেখে আসা ঘর-গৃহস্থালি সামলানোর দায়দায়িত্ব বর্তাচ্ছে পরিবারের মহিলাদের ওপর। এই মহিলারা তখন পরিণত হচ্ছেন স্ব-নিযুক্ত কর্মীতে। নিজের কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন

সারণি-২
শিল্পের প্রধান প্রধান বিভাগে কর্মীদের বণ্টন, ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০১১-১২ সাল

শিল্প	১৯৯৯-০০		২০০৪-০৫		২০১১-১২	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
কৃষি	৫২.৭	৭৫.৪	৪৮.৬	৭২.৮	৪২.৫	৬২.০
খনন ও উত্তোলন	০.৭	০.৩	০.৭	০.৩	০.৬	০.৩
শিল্পোৎপাদন	১১.৫	৯.৫	১২.৪	১১.৩	১২.৬	১৩.৪
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ	০.৪	০.০	০.৪	০.০	০.৪	০.১
নির্মাণ	৫.৮	১.৬	৭.৬	১.৮	১২.৪	৬.০
পরিষেবা	২৮.৮	১৩.২	৩০.২	১৩.৭	৩১.৫	১৮.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সূত্র : কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব প্রতিবেদন, বিভিন্ন দফায়, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা

তারা। ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা বছরের পর বছর সটান কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪ শতাংশে। নিয়মিত শ্রমিক-কর্মীদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশই (৬ শতাংশ মাত্র) মহিলা। যদিও এক্ষেত্রে এখন বৃদ্ধি চোখে পড়ছে কিছুটা।

আসা যাক শহরাঞ্চলের মহিলা কর্মীদের প্রসঙ্গে। এদের ক্ষেত্রে মোটের উপর সার্বিক পরিস্থিতির অগ্রগতি ঘটছে। কারণ, নিয়মিত কর্মী হিসাবে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির দৌলতে বিগত ২০ বছরে এই হার ১০ শতাংশের মতো বেড়েছে। তবে শহরাঞ্চলেও মহিলাদের কর্মনিযুক্তির হার অত্যন্ত কম; ২০১১-১২ সালে তা ছিল মাত্রই ১৫ শতাংশ। এর সঙ্গে আবার নিয়মিত কাজের সঠিক সংজ্ঞা কী, সেই জটিলতা যুক্ত হয়ে সার্বিক প্রবণতার প্রকৃত ছবিটা অনেকখানি ম্লান দেখায়। ন্যূনতম মজুরি এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ/শর্ত-সহ প্রথাগত নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক কাজ হয়তো তা নয়; হয়তো অত্যন্ত খারাপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অনেক কিছুর সাথে আপোস করে কাজ করে যেতে হচ্ছে; তা স্বত্ত্বেও এর মাধ্যমে মহিলাদের নিয়মিত কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে এটাই বড়ো কথা। যদিও সে কাজের স্থায়িত্ব কত দিনের তার স্থিরতা নেই। এই ধরনের কাজের মধ্যে বেতনের বিনিময়ে ঘরকন্নার কাজ এবং দোকানের কর্মচারী, রিসেপসনিস্ট ইত্যাদির মতো অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রের কাজকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের চুক্তিভিত্তিক কাজও পড়ছে। কাজেই নিয়মিত কর্মীদের একটা বড়সড় অংশকে দেখা উচিত ক্রমবর্ধমান অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অংশ হিসাবে। আরেকটি প্রবণতাও লক্ষণীয়, তা হল স্ব-নিযুক্ত উপার্জনে এক শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি। কী প্রকৃতির কাজকর্ম এগুলি? এক দিকে মহিলারা সম্ভবত পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই কিছু পরিমাণ আয়-উপার্জন করতে পারছেন। যা কি তারা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করতে পারছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোজকার সাংসারিক প্রয়োজনে। যাই হোক, এই স্ব-নিযুক্ত মহিলাদের সিংহভাগই কিন্তু খুব ছোটোখাটো উদ্যোগপতিও নন। কিন্তু বিড়ি, তাঁত-বয়ন, চুড়ি ও টিপ ইত্যাদি তৈরি, প্যাকেজিং জাতীয় উদ্যোগে বাড়িতে বসে অবসর সময়ে কাজ করেন এমন শ্রমিক-কর্মীদের যে ব্যাপক ছড়ানো ছিটানো ভিত্তি রয়েছে এই মহিলারাও তারই অংশ বিশেষ। বাড়ি বসে কাজের ক্ষেত্রে; তা উৎপাদিত জিনিসের সংখ্যার হিসাবেই হোক বা ঘণ্টার হিসাবে, মজুরির হার বেশ কম। তাই এই কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যেতে হয়, তথা দুঃসহ পরিশ্রম করতে হয়। এবং সেই পরিমাণ কাজ পাওয়ার জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় ঠিকাদারের উপর। অনেক মহিলার ক্ষেত্রে কাজ করা স্বত্ত্বেও কর্মী হিসাবে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই স্বীকৃতি জোটে না। সেক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে যে কঠোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তার দরুন তারা সম্ভব হলেই কাজ ছেড়ে দেন। পরিষেবা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বৃদ্ধির হার বেশ দ্রুত। এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের স্বরূপ বুঝতে হলে পরিষেবার আওতাভুক্ত বিভিন্ন কাজের এলাকার মধ্যে বিলিবণ্টনে খুব মনোযোগ-সহ নজর দেওয়াটা বিশেষ জরুরি। যে জায়গাটা খটকা লাগার মতো, তা হল সিংহভাগ মহিলার কর্মনিযুক্তি কিন্তু ব্যাপার/বাণিজ্য, আতিথেয়তা, যোগাযোগ-এর মতো ক্ষেত্রে ঘটছে না। বৃদ্ধিটা মূলত নজরে পড়ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং গৃহস্থালির কাজে (কর্মরত মানুষজনের পরিবারে)। ঘরকন্নার কাজে মজুরি/পারিশ্রমিক এবং কাজের শর্তাদির নিরিখে ব্যাপক তারতম্য চোখ পড়ে। ব্যক্তি বিশেষের (যিনি কাজে নিচ্ছেন তার) ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর এই কাজের যাবতীয় আনুসঙ্গিক দিক ক্রমাগত নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির তরফে কোনও আইন বলবৎ না থাকাটা একটা ইস্যু। বহু রাজ্য এখনও এই সব কর্মীদের ন্যূনতম মজুরির ছাতার আওতাতেই আনতে পারেনি।

মহিলাদের স্বাধীন কর্মী হিসাবে মর্যাদা এনে দিতে পারে এরকম সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটি হল সম্ভবত শিক্ষাক্ষেত্র। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরেই বেসরকারীকরণের সাংঘাতিক রমরমা জাঁকিয়ে বসেছে। যে সব মহিলা এই ক্ষেত্রে কর্মরত, তাদের প্রায়শই চাকরির স্থায়িত্ব নিয়ে আশংকা, বিভিন্ন ভাবে শোষণের শিকার, প্রাপ্য পারিশ্রমিক বকেয়া রয়ে যাওয়ার মতো বিষয়ের সঙ্গে যুঝতে হয়।

আরেকটি উল্লেখনীয় বিষয় হল, কেন্দ্রের তরফে রাজ্যগুলিতে চালু/রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প-কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি। যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা (ASHA) কর্মী ইত্যাদি। এই সব কর্মীদের উপর বহুবিধ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে; কিন্তু সরকার এদের কর্মী হিসাবে গন্য করে না; এদের ধরা হয় স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে, যারা কেবল সামান্য পরিমাণ সাম্মানিক দক্ষিণা পাওয়ার যোগ্য। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মহিলাদের জন্য বেতন ভিত্তিক কাজের যে ক্ষেত্রগুলিতে বৃদ্ধি ঘটছে তা পরিচর্যা বিষয়ক

কাজকর্মের সমগোত্রীয়। বহু দিন ধরেই এ জাতীয় কাজকর্মকে মূলত মেয়েদের দায়িত্ব হিসাবেই দেখা হয়ে আসছে। পরিচর্যা বিষয়ক কাজকর্মে ক্রমাগত অবমূল্যায়নের প্রতিফলন নজরে পড়ছে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পারিশ্রমিক/বেতন/সাম্মানিক দক্ষিণা ইত্যাদির স্তরে।

বেকারত্ব বিষয়ক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ইস্যুগুলির সঠিক সূচক মেলা ভার; কারণ গরিব মানুষজন আধাবেকার অবস্থায় দিন কাটাতে পারেন, কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে পারেন, কিন্তু বেকার হয়ে বসে থাকার বিলাসিতা দেখাতে পারেন না। বাজারের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ছাড়াও মহিলারা অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত থাকেন। যেমন—জ্বালানি কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ, পানীয় জল ও বনজ সামগ্রী জোগাড়, ঘরে ব্যবহারের জন্য সুতো কাটা, তাঁত বোনা ইত্যাদি। সমীক্ষায় ধরা পড়ছে, নতুন-উদার অর্থনৈতিক নীতির সূত্রে মহিলা তথা পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনে বেতন ভিত্তিক কাজের সুযোগ কমে আসায় এই সব কাজে মহিলাদের শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলাদের বেতন ভিত্তিক কর্মনিযুক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে দু'টি বিষয় সম্পর্কিত। এক তো এধরনের কাজের সুযোগ না থাকা বা তা কমে আসা। দ্বিতীয়ত, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করা, তাদের ও বয়স্কদের পরিচর্যা করা এবং ঘরকন্না সামলানোর দায়দায়িত্বের চাপ গোটাটাই তাদের বইতে হয়।

সমান পারিশ্রমিক বিধি, ১৯৭৪ পাস হওয়ায় বহু বহু বছর বাদেও পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মজুরির ফারাক এক চরম বাস্তব হিসাবে রয়ে গেছে। সব বয়সী, সব শ্রেণির, সব সম্প্রদায়ের, সব অঞ্চলের মহিলারাই এই বৈষম্যের শিকার। এই বিধির সঠিক রূপায়ণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় (ILO, 2017) উঠে এসেছে যে, লিঙ্গের ভিত্তিতে মজুরি/পারিশ্রমিকের বৈষম্যের নিরিখে জঘন্য পরিস্থিতি চাক্ষুষ করা যায় যে সব দেশে তার মধ্যে ভারত অন্যতম। এখানে একই কাজের জন্য পুরুষেরা মহিলাদের থেকে বেশি পারিশ্রমিক পান; কখনও কখনও তা ৩০ শতাংশের গণ্ডিও ছাড়িয়ে যায়। এদিকে আবার সব চেয়ে কম মজুরির শ্রমিক শ্রেণিতে ৬০ শতাংশই মহিলা; পক্ষান্তরে সব চেয়ে বেশি মজুরি জড়িত এমন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের মাত্র ১৫ শতাংশ মহিলা।

সারণি-৩
পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান বিভিন্ন বিভাগে কর্মীদের বণ্টন, ১৯৯৯-২০০০ সাল ২০১১-১২ সাল

পরিষেবা	১৯৯৯-০০		২০০৪-০৫		২০১১-১২	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
ব্যাপার	৪০.৮	২৭.৮ ১২.০	৪১.৩	২৪.৪ ১১.২	৩৯.৭	২২.৭ ১১.০
হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৪.৮	৫.১ ১৭.৭	৫.২	৫.৮ ১৯.৫	৬.২	৫.২ ১৫.৪
পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও যোগাযোগ	১৮.৩	২.৭ ২.৯	১৯.৪	২.৬ ২.৮	১৯.২	১.৮ ২.০
সরকারি প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১২.১	৭.৫ ১১.০	৮.৬	৫.৪ ১১.৮	৬.৮	৪.৪ ১২.২
শিক্ষা	৬.৮	২১.১ ৩৮.৪	৭.২	২৪.৩ ৪১.৯	৭.৬	২৭.০ ৪৩.৫
অন্যান্য সম্প্রদায়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পরিষেবা	৮.৪	১৯.১ ৩১.২	৭.০	৯.৩ ২২.৩	৬.২	১ .৫ ২৮.৬
ব্যক্তিগত গৃহস্থালি সংক্রান্ত সহ কর্মরত ব্যক্তি	০.৭	৬.৭ ৬৪.০	১.৫	১৬.৬ ৭০.৯	১.২	১১.৭ ৬৭.২
অন্যান্য পরিষেবা	৮.০	১০.১ ২০.১	৯.৯	১১.৫ ১৯.৯	১৩.০	১৫.৭ ২০.৭
মোট	১০০.০	১০০.০ ১৬.৭	১০০.০	১০০.০ ১৭.৬	১০০.০	১০০.০ ১৭.৮

সূত্র : ইউনিট স্তরীয় পরিসংখ্যান, বিভিন্ন দফায়, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা

"মহিলাদের স্বাধীন কর্মী হিসাবে মর্যাদা এনে দিতে পারে এরকম সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটি হল সম্ভবত শিক্ষাক্ষেত্র। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরেই বেসরকারীকরণের সাংঘাতিক রমরমা জাঁকিয়ে বসেছে। যে সব মহিলা এই ক্ষেত্রে কর্মরত, তাদের প্রায়শই চাকরির স্থায়িত্ব নিয়ে আশংকা, বিভিন্ন ভাবে শোষণের শিকার, প্রাপ্য পারিশ্রমিক বকেয়া রয়ে যাওয়ার মতো বিষয়ের সঙ্গে যুঝতে হয়।"

সরকারের হস্তক্ষেপ

মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিষয়টির পৃষ্ঠপোষকতা করতে তথা কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিবিধ পন্থাপদ্ধতি গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে আমাদের। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই সময়পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হল মহিলাদের স্ব-নিয়োজিত কর্মী হিসাবে গড়ে তোলা। এক সুনির্দিষ্ট বিশেষ ধারণার সূত্রে এই পুরো বিষয়টির উৎপত্তি; অপ্রথাগত ক্ষেত্রে মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি এবং উন্মুক্ত বাজারের মধ্যে যোগসূত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে উদারীকরণের সুফলদায়ী প্রভাবকে সার্থকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব (Neetha, 2010)। অতিক্ষুদ্র-ঋণ (Micro-Credit) ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানের (NGO) সাহায্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী তৈরি, এবং এরকম বিবিধ দিক থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে

"যাবতীয় রাস্তা আঁকড়ে ধরে যাবতীয় করণীয় কর্মসম্পাদনের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি" সম্পন্ন এক অ্যাজেণ্ডা তৈরি করা হয়। যার একমাত্র উদ্দেশ্য, মেয়েদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে বের করে আনা এবং তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের দিশায় তৎপরতা বাড়ানো। এই সূত্রেই উদারীকরণ পরবর্তী সময়পর্বে বিভিন্ন মন্ত্রকের আওতায় মহিলাদের জন্য স্ব-কর্মনিযুক্তিকে প্রোৎসাহিত করার লক্ষ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ কর্মসূচি চালু করা হয়। যাই হোক, কৃষিক্ষেত্রে মেয়েদের কর্মসংস্থানের ঘাটতির মোকাবিলায় এই উদ্যোগের বিশেষ অবদান চোখে পড়েনি।

প্রাথমিক সংকট কাটিয়ে উঠতে "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প" (MGNREGS) খানিকটা সাহায্যে এসেছিল বটে; কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে নিশ্চিত করে কাজ পাওয়ার দিনের সংখ্যা কমতে থাকায় তথা কায়িক শ্রমের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের গোলকধাঁধার জট ছাড়তে এই প্রকল্প বিশেষ কাজে আসেনি। মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ যে আশানুরূপ হয়নি তার পেছনে মূল কারণ দু'টি। এক তো মহিলা হিসাবে তাদের উপর সব সময়ই আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট কিছু দায়দায়িত্ব পালনের চাপ থাকে; দ্বিতীয়ত, তাদের দক্ষতা বা নৈপুণ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বাচ্চা প্রসব ও শিশু পরিচর্যার চাহিদা মেটাতে ছুটিছাঁটা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অল্প বয়সী অনেক মেয়ে কর্মনিয়োগে আগ্রহ দেখায়নি এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। ২০১৭ সালের মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা আইন (সংশোধনী)-এর দৌলতে মাতৃত্বকালীন ছুটির দিনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বটে, কিন্তু তার আওতা সীমাবদ্ধ কেবল সংগঠিত ক্ষেত্রের গণ্ডিতে। ১২ সপ্তাহের পরিবর্তে এই সংশোধনীতে ২৬ সপ্তাহের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়াও এই আইনে ৫০ জন

বা তার বেশি কর্মী রয়েছে এমন সংস্থার ক্ষেত্রে ক্রেশের বন্দোবস্ত রাখার; নিয়োগকর্তার বিবেচনা সাপেক্ষে বাড়ি বসে কাজ করার সংস্থার রাখার মতো প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। এই সংশোধিত আইন অবশ্য সব সংস্থার জন্য প্রযোজ্য নয়; অন্তত ১০ জন কর্মী থাকলে তবেই তা লাগু হবে। নিম্ন আয়ের বন্ধনীভুক্ত মহিলারা, যারা মূলত অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত, এমন কি একটি মাত্র দিনের জন্যও সবেতন ছুটির হকদার নন। শহরাঞ্চলে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে, যেখানে শিক্ষা ও উপার্জনের স্তর উঁচু, বহু বিবাহিত মহিলা শিশুর জন্ম দেওয়ার পর তাদের পরিচর্যার দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ায় শ্রমশক্তি থেকে হারিয়ে যান। কাজেই দরকার যেটা তা হল, মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধার ছত্রচ্ছায়ায় সব মহিলা কর্মীকে নিয়ে আসা এবং আইনের কঠোরভাবে রূপায়ণ। এর সাথে যদি সব সংস্থাতেই ক্রেশের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় তবে মহিলারা নিজের জীবনচক্র সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জের সঙ্গে কর্মসংস্থানের আপোস করার সময় খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় থাকবেন।

শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের এই যে করুণ ছবি, তার অন্যতম প্রধান কারণ তাদের যোগ্যতার উপযুক্ত কাজকর্মের বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে। অর্থাৎ, তারা যে ধরনের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে আর যে ধরনের কাজ তারা হাতের কাছে পাচ্ছেন—উভয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। মহিলাদের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে দরকার একটা "U" আকৃতির নকশা তৈরি করা। মাঝারি মানের শিক্ষিত শ্রেণির জন্য কর্মনিযুক্তির হার নগণ্য। কাজেই সেকেণ্ডারি ও টার্শিয়ারি স্তরের শিক্ষা, মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে আরও বেশি বেশি বিনিয়োগ দরকার। পাশাপাশি সব ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা সম্পন্ন মহিলাদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংস্থান করতে হবে। পারিবারিক সামর্থ্য থাকলে মহিলারা নিম্ন হারের পারিশ্রমিক, কর্মস্থলের অনুপযুক্ত পরিবেশ, কাজের কঠোর

শর্ত ইত্যাদি নিরুৎসাহিত করার মতো কার্যকারণের ফলস্বরূপ কর্মজীবনকে ত্যাগ করে। শিক্ষানবিস আইনের নবতম সংশোধনীতে [The Apprentices (Amendment) Act, 2014] নিয়োগ কর্তাতে বাড়তি সময়ের জন্য বহু সংখ্যক শিক্ষানবিস নিয়োগ করার তথা নিজের বিচার-বিবেচনা মতো কত ঘণ্টা তারা কাজ করবেন,. ছুটিছাটা কত দিন পাবেন ইত্যাদি ঠিক করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি কর্মীদের আশাহত করার মতো প্রভাব ফেলতে পারে।

সামাজিক এবং কৃষ্টিগত বাধাবিপত্তি (যদিও অঞ্চল ও সম্প্রদায় বিশেষে এর ধরনধারণ পালটে যায়) এখনও বড়ো ইস্যু, যা কর্মসংস্থানে মহিলাদের অংশগ্রহণের করুণ ছবিটার ব্যাখ্যা দিতে পারে। গ্রাম ও শহরাঞ্চল, সব জায়গাতেই আজকাল পরিবারগুলি নিজেদের ঘরের মেয়েদের শিক্ষাদানে উত্তরোত্তর সদিচ্ছা দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু একে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির তরফে তাদের মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য এক বিনিয়োগ হিসাবে এখনও দেখা হয় না। যে সব মহিলা আপোস না করে এসব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে পেরিয়ে এসেছেন, তারা সংখ্যায় নগণ্য। বাকিদের মধ্যেও অনেকে স্রেফ পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কাজেই পরিসংখ্যানই স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে, মহিলারা মূলত নিয়োজিত আছেন অপ্রথাগত, আধা-দক্ষ বা অদক্ষ কাজকর্মে, যেমন—গৃহস্থালির কাজ, যেখানে উপার্জন অত্যন্ত কম তথা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বা কাজের নিরাপত্তা সীমিত।

মেয়েদের নিরাপত্তাকে ঘিরে যে উদ্বেগ-আশংকা ক্রমাগত বাড়ছে, সেটিও মহিলাদের কর্মসংস্থানের পায়ে স্পষ্টতই বেড়ি পরিয়ে দিচ্ছে। মহিলাদের জন্য রাতের শিফট-এর কাজ বন্ধ করার বিষয়টি ১৯৪৮ সালের শিল্পকারখানা আইনের সংশোধনীর অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যালোচনাধীন রয়েছে। তা সত্ত্বেও বহু রাজ্য সরকারই এই নিষেধাজ্ঞা এখনই তুলে দিয়েছে। কর্মস্থলে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা এবং মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত যাতায়াতের ব্যবস্থার সংস্থান পর্যালোচনার বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছে বটে; কিন্তু অগ্রাধিকারের পিছনের সারিতে, কারণ কার্যক্ষেত্রে কোনও নজরদারীর ব্যবস্থাপনা রাখা হয়নি। কর্মস্থলে, যাতায়াতের পথে, প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা এত বেশি ঘটছে যে তা এই ধারণাতেই ইন্ধন জোগাচ্ছে যে নগরী এবং শহরগুলি আর নিরাপদ নয়। সেই সূত্রেই মহিলাদের কাজের জগতে যুক্ত হওয়ার ঝোঁকের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে।

এই সব অনিশ্চয়তার মাঝেও ক্ষমতায়নের রুপোলি রেখা নজরে আসছে। মহিলা কর্মীরা বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরে এগিয়ে আসছেন। যার দরুন প্রতিরোধ-বিক্ষোভের মাধ্যমে ছাপ ফেলা যাচ্ছে। দেশের শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের হারের সাপেক্ষে শতাংশের হিসাবে ইউনিয়নের খাতায় নাম লেখানো মহিলা কর্মীদের অংশভাক অনেকটাই বেশি। মূলত মহিলা কর্মীদের সংখ্যাধিক্য বিশিষ্ট দু'টি ক্ষেত্র, যেখানে কর্মীরা ইউনিয়নের ছাতার তলায় সামিল হন ব্যাপক পরিমাণে, এখানে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এরা হলেন, প্রকল্প-কর্মী এবং গার্হস্থ্যকর্মে নিয়োজিত কর্মী। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বহু আগে থেকেই নিজেদের সংগঠিত করে তুলেছেন। অন্য দিকে, গৃহপরিচারিকার কাজে নিযুক্ত মহিলারা হালেই ইউনিয়নে সামিল হতে শুরু করেছেন বটে; তবে বেশ ব্যাপক আকারে। এরা নিজেদের শ্রমের যে অবমূল্যায়ন হয়ে আসছে সে সম্পর্কে সচেতন, এবং তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

পরিশেষে

উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসাবে বলা যেতে পারে, সরকার এবং নিয়োগ কর্তাদের এক সাথে আলোচনায় বসার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। মাঝে সাঝে আধাখেঁচড়া ভাবে হস্তক্ষেপের বদলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িত ইস্যুগুলির সঠিক পন্থায় মোকাবিলায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উল্লেখিত দু'পক্ষকে এক সর্বাত্মক সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে হবে আলাপ-আলাচনার মাধ্যমে। শ্রম বিধিগুলি আদ্যপ্রান্ত সংশোধিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এই কাজের সময় সংশোধনীর উপর লিঙ্গ বৈষম্যের কী প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়টি ধর্ত্যবের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। ❑

(লেখক নয়াদিল্লি স্থিত "Centre for Women's Development Studies"-এর বরিষ্ঠ অধ্যাপক। ইমেল : neethapillai@gmail.com)

উল্লেখপঞ্জি :

- International Labour Organisation (ILO) (2017). The Global Wage Report 2016-17, International Labour Organisation (ILO), Geneva
- International Labour Organisation (ILO) (2016). World Employment and Social Outlook: Trends 2016, International Labour Organisation (ILO), Geneva
- Kapsos, Steven; Silberman Andrea &Evangelia, Bourmpoula (2014) .Why is female labour force participation declining so sharply in India? ILO Research Paper No. 10, International Labour Office, Geneva
- Neetha N (2014). 'Crisis in Female Employment: Analysis across Social Groups', *Economic and Political Weekly*, Vol XLIX, No. 50.
- Neetha N. (2010). 'Self-Employment of Women: Preference or Compulsion?' *Social Change*, Volume 40, No .2, 2010

শিশুশ্রম আইন সংস্কার ও শিশুশ্রম বিলোপ

*বাল্যকালকে কঠোর শ্রমের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলগুলি মূলত ঝাঁক বেঁধে আছে শিশু শ্রম আইনকে কেন্দ্র করে। শুধুমাত্র সামাজিক রীতিনীতি, লোকজনের মনোভাব ও আচরণ এবং তার প্রকাশ খতিয়ে দেখা নয়; মানসিকতা, লোকাচার ও সংস্কার থেকে উত্থিত সামাজিক পাপ দমাতেও আইনকে সবসময়ই এক হাতিয়ার রূপে গণ্য করা হয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা জটিল শিশুশ্রম সমস্যার মোকাবিলায় আইনের হস্তক্ষেপ তাই অপরিহার্য। সাধারণভাবে ও বিশেষত ঝুঁকিবহুল পেশায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার লক্ষে ভারতে জাতীয় শিশু শ্রম নীতির তিনটি উপাদানের মধ্যে অন্যতম হল আইনি কর্ম-পরিকল্পনা। কার্যকরী হাতিয়ার হয়ে উঠতে গেলে আইনকে যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত হতে হবে। আইনে থাকা চলবে না কোনও ফাঁকফোকর। শিশু শ্রম (নিবারণ ও নিয়ামক) আইন ১৯৮৬ সংশোধন করা হয় ২০১৬ সালে। সমস্ত পেশায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ এবং ২০০৯ -এর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন মোতবেক শিশুর অধিকারের প্রেক্ষিতে তাদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে সহায়তা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক শ্রম চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাজের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করাও এর লক্ষ্য। এই চুক্তি মাফিক কাজে ঢোকার নূন্যতম বয়স বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করার বয়স থেকে কম হওয়া চলবে না এবং কোনওক্ষেত্রেই তা যেন ১৫ বছরের কম না হয়। চুক্তিটি জরুরি ভিত্তিতে জঘন্য শিশু শ্রম নিষিদ্ধ ও বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। ভারতে শিশু কর্মীদের হালহকিকতের প্রেক্ষাপটে শিশু শ্রম আইনে হালফিলের সংস্কার নিয়ে কলম ধরেছেন—***হেলেন আর. সেকার***

শিশু ও শ্রম এই শব্দ দু'টি পরস্পরের বিপরীত। "শিশু" বলতে বোঝায় সারল্য ও কোমলতা। পক্ষান্তরে "শ্রম" হাড়ভাঙ্গা খাটনির ইঙ্গিতবাহী। শিশুরা কাজ করে আসছে বহুকাল আগে থেকে। বিশ্বাস করা হয় যে কাজ শিশুকে আস্থা জোগায়, স্বমর্যাদা অর্জনে তাদের সক্ষম করে এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াতেও করে সাহায্য। এটাও মনে করা হয় যে কাঁচা বয়স থেকে কুশলতা অনুশীলনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী দক্ষতা সংরক্ষণ করা যায় এবং তা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় অনায়াসে। তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, শিশুকে জবরদস্তি কাজ করালে ও শৈশব থেকে বঞ্চিত করলে এবং শিক্ষা তথা অন্যান্য অধিকার ও সুযোগসুবিধা না দিলে কাজের এসব ইতিবাচক দিক বদলে যায় নিদারুণভাবে। শিশু শ্রমিকদের মজুরি জোটে যৎকিঞ্চিৎ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাপ-মা বা পরিবারের অন্য কারও ঋণের বদলে বিনে পয়সায় তাদের খাটিয়ে নেওয়া হয়। শিশু শ্রমিকদের কত না রকমফের দেখা যায়, যেমন—মজুরি প্রাপ্ত/মজুরিহীন শিশু শ্রমিক; দাসখত নেওয়া শিশু শ্রমিক, পরিবারের হয়ে কাজ করা শিশু; স্বনিযুক্ত শিশু; ঘরগেরস্থালি/কলকারখানার কাজে লাগা শিশু; ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া/ঘরবাড়ি না ছাড়া শিশু কর্মী।

নানা সময় বিভিন্ন সূত্র মারফত পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায়, কৃষি, পশুপালন, কারখানা, খাবারদাবার তৈরি এবং অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্র-সহ অসংগঠিত অর্থনীতির হরেক এলাকায় শিশু শ্রমিক নিযুক্ত আছে। কিছু কিছু পেশায়, কাঁচামাল জোগাড় থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জোড়া— উৎপাদনের যাবতীয় পর্যায়ে শিশুদের লাগানো হয়। তারা কাজ করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। অনেক সময় তাদের কাছে থাকে বিষাক্ত রাসায়নিক, পোকামাকড়ের কামড় খাওয়ার ঝুঁকি। কলকারখানায় ধাতব এবং অন্যান্য গুঁড়ো মুখে পড়ে তারা ভোগে নানা রোগ বালাইয়ে। যেমন, মিলিকোসিস (কাচ কারখানা), অ্যাসবেস্টসিস (সিমেন্ট ও স্লেট), হাঁপানি (রেশম, বস্ত্র, কার্পেট), যক্ষ্মা (বিড়ি), ধনুষ্টঙ্কার (হাবিজাবি-ছেঁড়ামযলা জিনিস কুড়ানো) চোখের অসুখ (ছুঁচসুতোর কাজ-জারদৌসি, জরি)। এসব রোগের কিছু দুরারোগ্য। বিপজ্জনক কাজে শিশু শ্রমিক নিয়োগের একটি উদাহরণ হচ্ছে বক্স মোল্ড ফার্নেসে পিতল তৈরি। ফার্নেস বা চুল্লির আগুন জ্বালিয়ে রাখতে শিশু শ্রমিক হাত চাকা ঘুরিয়ে চলে। মাটির তলার চুল্লির উপরের ঢাকনা খুলে ধাতু ঠিকঠাক গলল কিনা যাচাই করে। চুল্লির মধ্যে সামান্য রাসায়নিক পাউডার বা গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়। গলিত পিতল ঢালাইয়ের উপযুক্ত হলে, চুল্লির মুখ থেকে উঠবে নীল ও সবুজ শিখা। শিশু শ্রমিক তখন বড় চিমটে দিয়ে গলিত সেই পিতল চুল্লি থেকে তুলে ঢালবে ছাঁচে। উত্তপ্ত ছাঁচ খোলা ও ছাঁচে তৈরি জিনিস বার করতে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে সাহায্য করাও তার কাজ। চুল্লির পাশে খালি পায়ে খাড়া থেকে শিশু শ্রমিক তামা ও দস্তা চুল্লির মধ্যে ঢোকায় এবং বের করে। এসব কাজ চলার সময় চুল্লির ধোঁয়া ও বাষ্প ঢোকে তার

চোখেমুখে। শরীরের যে কোনও অংশ পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে পদে পদে। শুধু কি তাই, চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা সমূহ, পালিশ করার সময় ধাতুর গুড়ো নাকমুখ দিয়ে ঢোকার দরুণ শ্বাসযন্ত্রে ঘটতে পারে সংক্রমণ। ফলে স্পনডিলাইটিস, আংকিলসিস-এর মতো রোগ হতে পারে। শিরদাঁড়ায় চিরকালের মতো বিকৃতির আশঙ্কাও থাকে বৈকি। তালা তৈরির কারখানায় পালিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ও স্প্রে পেন্টিং-এর মতো কাজকর্মে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকেরও এহেন ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হয়। শিশু শ্রম শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর এবং তার সার্বিক উন্নয়নে ঘটায় ব্যাঘাত। শিশু শ্রম নামের এই শোষণ বন্ধ করার জন্য চাই গরিবি, বেকারি, নিরক্ষতার মতো পরস্পর সম্পর্কিত দিকগুলির প্রতি নজর দিয়ে এক সুস্পষ্ট জাতীয় নীতি ও সরকারি ব্যবস্থা।

শিশু শ্রম সমস্যা সমাধানে ভারত সরকার আগাগোড়াই সক্রিয়। এর সাক্ষ্য মেলে শিশুদের ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ও বিভিন্ন শ্রম আইনে নানাবিধ সংস্থান এবং সময়ে সময়ে সেগুলির সংশোধন থেকে। জাতীয় শিশু শ্রম নীতির লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার ঠিক করার পাশাপাশি, শিশু শ্রম আইন রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করেছে। বিপজ্জনক পেশা ও প্রক্রিয়ায় কর্মরত শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে এই নীতি ধাপে ধাপে এগোনোর কথা ভেবেছে। কাজ থেকে শিশুদের ছাড়িয়ে নেওয়া ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার হাত দিয়েছে নানা ধরনের প্রকল্পে। পুনর্বাসন প্রকল্প ছকা এবং তার রূপায়ণ ও নজরদারিতে সাহায্য করার জন্য সরকার টাস্ক ফোর্স বা কর্মীগোষ্ঠী গঠন করেছে।

শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার ২০০৯ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারত সরকার শিশুদের জন্য শিক্ষার অধিকার এক মৌলিক অধিকারের রূপ দিয়েছে। ৬-১৪ বছর বয়সি সব শিশুর জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। স্কুলে শিশু ভর্তি ও ক্লাসে হাজিরা এখন বাড়ছে। শিশু শ্রম নীতির লক্ষ্য পূরণে অগ্রগতির আরও এক সাক্ষ্য হচ্ছে, ২০০১-য় ১ কোটি ২৭ লক্ষ শিশু শ্রমিকের তুলনায় ২০১১-তে তা কমে দাঁড়ায় ১ কোটি ১ লক্ষ। প্রায় সেই সময়কালে, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার হিসেবে দেখা গেছে ২০০৪-'০৫-এ ৯০ লক্ষ ৭ হাজার এর জায়গায় ২০০৯-'১০-এ শিশুকর্মীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ ৯৮ হাজার।

"শিশু শ্রম সমস্যা সমাধানে ভারত সরকার আগাগোড়াই সক্রিয়। এর সাক্ষ্য মেলে শিশুদের ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ও বিভিন্ন শ্রম আইনে নানাবিধ সংস্থান এবং সময়ে সময়ে সেগুলির সংশোধন থেকে। জাতীয় শিশু শ্রম নীতির লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার ঠিক করার পাশাপাশি, শিশু শ্রম আইন রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করেছে। বিপজ্জনক পেশা ও প্রক্রিয়ায় কর্মরত শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে এই নীতি ধাপে ধাপে এগোনোর কথা ভেবেছে। কাজ থেকে শিশুদের ছাড়িয়ে নেওয়া ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার হাত দিয়েছে নানা ধরনের প্রকল্পে। পুনর্বাসন প্রকল্প ছকা এবং তার রূপায়ণ ও নজরদারিতে সাহায্য করার জন্য সরকার টাস্ক ফোর্স বা কর্মীগোষ্ঠী গঠন করেছে।"

শিশু শ্রম (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৬, ১৮-টি পেশা ও ৬৫টি প্রক্রিয়ায় ১৪ বছরের কম বয়সিদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে। ২০১৬-তে এই আইন সংশোধনের পর ১৪ বছরের কম বয়সিদের কোনও পেশাতেই কাজে লাগানোয় পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুসারে, ১৪ বছর পেরিয়েছে অথচ ১৮ বছরের কম বয়সিরা হচ্ছে কিশোর। কারখানা আইন ১৯৪৮-এ উল্লিখিত বিপজ্জনক ও ঝুঁকিবহুল পেশা বা প্রক্রিয়ায় ১৮ বছরের কম বয়সিদের কাজ করা একেবারে নিষিদ্ধ। সংশোধিত এই আইন তৈরির পর পরই বিপজ্জনক পেশা ও প্রক্রিয়ার তালিকা বা তপশিল খতিয়ে দেখার জন্য গড়া হয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি। ইতোমধ্যে কমিটির রিপোর্টও জমা পড়েছে। রিপোর্টে তপশিলকে দু'ভাগ করার সুপারিশ আছে। প্রথম ভাগে পড়ছে কিশোরদের জন্য নিষিদ্ধ বিপজ্জনক পেশা ও প্রক্রিয়ার তালিকা। দ্বিতীয় ভাগে আছে সেইসব বিপজ্জনক পেশা ও প্রক্রিয়া যাতে শিশুদের কাজে লাগানো বেআইনি। প্রথম ভাগে পড়ে নয় রকম পেশা ও প্রক্রিয়া। এতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পাতাল ও জলের তলায় কাজ এবং বিপজ্জনক প্রক্রিয়া জড়িত শিল্পের তালিকা। এর আওতায় পড়ে লোহা ও অন্যান্য ধাতু শিল্প, বেশ কিছু রাসায়নিক শিল্প, ঢালাই কারখানা, বিদ্যুৎ কারখানা, সিমেন্ট, রবার, পেট্রোলিয়াম, তিনটি সার শিল্প, ওষুধ, কাগজের মন্ড, পেট্রো-রয়াসন, রঙ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বা নিকেল, চামড়া, কাঁচ, চিনেমাটি কসাইখানা, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি।

স্কুল বন্ধের পর ও ছুটির কালে গেরস্থালি ও পারিবারিক সংস্থার কাজে শিশু সাহায্য করলে অবশ্য কোনও বিধিনিষেধ নেই। পরিবার বলতে বোঝায় কেবলমাত্র শিশুর মা, বাবা, ভাই, বোন, বাবার ভাই-বোন এবং

মায়ের বোন ও ভাই। সাহায্য করার মানে তা হবে নিখাদ স্বেচ্ছামূলক, টাকাকড়ির বিনিময়ে নয়। বিপজ্জনক পেশা বা প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা নিষিদ্ধ। দেখতে হবে, সাহায্য করতে গিয়ে শিশুর লেখাপড়ার যেন কোনও বাধা না পড়ে। বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ধারবাহিক বা এহেন অন্যান্য বিনোদন বা সার্কাস বাদ দিয়ে অন্যান্য ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠান-সহ দৃশ্য-শ্রাব্য বিনোদন শিল্পে শিল্পীরূপে শিশুর কাজ অবশ্য কিছু শর্তসাপেক্ষে নিষেধাজ্ঞা থেকে ছাড় পেয়েছে। শিল্পী বলতে বোঝায় অভিনেতা, গায়ক ও খেলোয়াড় শিশু। শিশু ও কিশোর শ্রম (নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৬-তে আরও কড়া সাজার ব্যবস্থা আছে। ৩ বা ৩ক ধারায় দোষী নিয়োগকর্তার ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হবে বা কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অবধি জরিমানা। ফের অপরাধ করলে আইনভঙ্গকারীর জেল হবে ১ থেকে ৩ বছর। ৩ বা ৩ক ধারা অমান্য করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শিশুকে কাজের অনুমতি দিলে আইনে তার বাবা-মা ও অভিভাবকের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। পয়লা অপরাধের জন্য কোনও সাজা নেই। ফের দোষী হলে অবশ্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড হবে।

কর্মস্থান থেকে উদ্ধার করা শিশু ও কিশোরদের জন্য আছে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। আইনে শিশু ও কিশোর শ্রমিক পুনর্বাসন তহবিল গড়ার কথা বলা হয়েছে। আইনটি এই তহবিলের পদ্ধতি প্রকরণও বিশদভাবে উল্লেখ করেছে। আইন বলবৎ করার জন্য জেলাশাসককে উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে আইনটি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে নিয়মিত নজরদারি চালানো সুনিশ্চিত করার দিকেও সরকারকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে।

"কর্মস্থান থেকে উদ্ধার করা শিশু ও কিশোরদের জন্য আছে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। আইনে শিশু ও কিশোর শ্রমিক পুনর্বাসন তহবিল গড়ার কথা বলা হয়েছে। আইনটি এই তহবিলের পদ্ধতি প্রকরণও বিশদভাবে উল্লেখ করেছে। আইন বলবৎ করার জন্য জেলাশাসককে উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে আইনটি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে নিয়মিত নজরদারি চালানো সুনিশ্চিত করার দিকেও সরকারকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে।"

চোদ্দ বছরের কম বয়সি সবাইকে স্কুলে ভর্তি ও পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে এই সংশোধিত শিশু শ্রম আইনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। সেইসঙ্গে শিশু শ্রমিককে শনাক্ত, উদ্ধার ও ইস্কুলে ভর্তি করা দরকার। চাই তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। এজন্য শিশুর বাড়ির প্রাপ্তবয়স্কদের কাজের দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ ও রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার। এক্ষেত্রে কাজের খোঁজে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দেওয়া ও অসহায় লোকজনের দিকে দিতে হবে বিশেষ নজর। শুধু সরকার নয়, সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, ক্ষমতা বাড়ানো, সংবেদনশীলতার মাধ্যমে শিশু শ্রম আইন সুষ্ঠুভাবে বলবৎ করার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ফলে সম্ভব হবে ভারতে শিশু শ্রমের অবসান।❑

(লেখক ভি. ভি. গিরি জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান-এর সিনিয়ার ফেলো এবং শিশু শ্রম বিষয়ে জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটর। ইমেল : helensekar@gmail.com)

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : স্বাস্থ্য

১. কোন দিনটি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে পালন করা হয়?

২. "জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম" (JSSK) প্রকল্প কবে থেকে চালু হয়েছে?

৩. দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় "Health Outcome Goals" হিসাবে মূলত কোন তিনটি লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে?

৪. Multi-drug-resistant tuberculosis (MDR TB) কী?

৫. স্বাধীনতার সময় ভারতে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর; বর্তমানে তা কততে দাঁড়িয়েছে?

৬. ভারতকে ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) পোলিও মুক্ত হিসাবে ঘোষণা করেছে। ভারতে কত সালে পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি চালু হয়েছিল?

৭. কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সম্প্রতি রোগীদের কাছ থেকে হাসপাতালের পরিষেবা সম্পর্কে ফিডব্যাক সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছে। সাতটি ভিন্ন ভাষায়, পরিষেবা মেলার সাত দিনের মধ্যে মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েব পোর্টাল-এর মাধ্যমে এই ফিডব্যাক জানানো যাবে। এই উদ্যোগের নাম কী?

৮. প্রতি মাসের ৯ তারিখে বিনা পয়সায় সমস্ত গর্ভবতী মহিলাকে সুনিশ্চিত, সার্বিক ও উন্নত গুণমানের গর্ভবস্থাকালীন পরিচর্যা দিতে যে কর্মসূচি চালু করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, তার নাম কী?

৯. AYUSH নামক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কত ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত?

১০. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান্যতা অনুযায়ী কত থেকে কত বছর বয়ঃসীমাকে বয়ঃসন্ধি (Adolescence period) বলা হয়?

১১. "প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা" (PMSSY) প্রকল্পের আওতায় দেশে AIIMS-এর ধাঁচে কয়টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে?

১২. "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭" কত তারিখে প্রকাশ করা হয়?

১৩. কত বছর বয়স হয়ে গেলে ভারতে ভ্রমণরত যে কোনও পর্যটকের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া-এই দুই ব্যাধির (অতিরিক্ত হিসাবে) ভ্যাকসিন নেওয়ার সুপারিশ করা হয়?

১৪. কত বছর বয়সের পর থেকে মহিলাদের (স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য) বছরে একবার "ম্যামোগ্রাম টেস্ট" করতে সুপারিশ করা হয়?

১৫. ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক মশা কামড়ানোর কত দিন পরে মানুষের শরীরে ডেঙ্গু রোগটি বিস্তারলাভ করে?

১৬. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি আগামী ২০২০ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ এবং ইয়েমেন থেকে যে রোগটি নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে তার নাম কী?

১৭. প্রতি বছর এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহটি (২৪-৩০ এপ্রিল) বিশ্ব টিকাকরণ সপ্তাহ (World Immunization Week) হিসাবে পালন করা হয়; এবছর এর থিম কী রাখা হয়েছে?

১৮. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, প্রতিষেধক/টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব এমন রোগের সংখ্যা ক'টি?

১৯. আমজনতার মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সাক্ষরতার প্রসার এবং একটি মাত্র সূত্র থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক যাবতীয় সঠিক তথ্য তাদের নাগালে পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের ১৪ নভেম্বর যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটি চালু করে তার নাম কী?

২০. ২০১৩ সালে চালু কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগ "RMNCH+A"-তে প্রজনন, মাতৃত্ব, নবজাত, শিশু স্বাস্থ্য ছাড়া আর কোন বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

উত্তর :

১. ৭ এপ্রিল। ২. পয়লা জুন, ২০১১। ৩. শিশু মৃত্যু হার (IMR) ২০১৭-এর মধ্যে প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্ম পিছু ২৫-এ নামিয়ে আনা; মাতৃ মৃত্যু হার (MMR) ২০১৭-এর মধ্যে প্রতি এক লক্ষ জীবিত শিশু জন্মপিছু একশো-এ নামিয়ে আনা; মোট উর্বরতার হার (TFR) ২০১৭-এর মধ্যে ২.১-এ নামিয়ে আনা। ৪. এই ধরনের যক্ষা ব্যাকটিরিয়ার যে স্ট্রেইন-এর কারণে হয় তা এই রোগের সবচেয়ে কার্যকরী দুই ওষুধ—Isoniazid এবং Rifampicin প্রতিরোধী তথা কেবল বিশেষ ধরনের ল্যাবরেটরিতেই রোগ নির্ণয় সম্ভব। ৫. ৬৬.৮ বছর। ১৯৯৫ সাল। ৭. মেরা অস্পতাল (My Hospital)। ৮. প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান। ৯. ৬ ধরনের—আয়ুর্বেদ, যোগ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা (Naturopathy), ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি। ১০. ১০ থেকে ১৯ বছর। ১১. ৬-টি, পাটনা, রায়পুর, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, যোধপুর এবং ঋষিকেশ-এ। ১২. ১৬ মার্চ, ২০১৭। ১৩. ৬৫ বছর। ১৪. ৪০ বছর। ১৫. ৫-৬ দিন। ১৬. Onchocerciasis (river blindness)। ১৭. "Close the Immunization Gap"। ১৮. ২৫-টি। ১৯. "National Health Portal"। ২০. বয়ঃসন্ধি বা Adolescence (+A'র মাধ্যমে তা বোঝানো হয়েছে)।❑

এবারের বিষয় : নতুন সাত 'পৃথিবী'-র খোঁজ

মহাকাশের বুকে আরও একটি পৃথিবীর খোঁজ পেতে বহু দিন ধরেই নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল নাসা। এবার সন্ধান মিলল সাত-সাতটা 'পৃথিবী'-র। নাসার দাবি, পৃথিবীর মতোই পরিবেশ এবং আবহাওয়া থাকার প্রবল সম্ভাবনা এই গ্রহগুলিতে। সম্প্রতি নতুন আবিষ্কৃত সৌরমণ্ডলের একটি ৩৬০ ডিগ্রি ভিডিও প্রকাশ করেছে নাসা। ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, ট্রপিস্ট-১ নামের একটি ছোটো নক্ষত্রকে মাঝে রেখে প্রদক্ষিণ করছে সাতটি প্রায় সম আয়তনের গ্রহ। যাদের মধ্যে তিনটির তাপমাত্রা ০-১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। পৃথিবী থেকে মাত্র ৪০ আলোক বর্ষ দূরে হওয়ায় এই সৌরমণ্ডল নিয়ে গবেষণার অবকাশ রয়েছে প্রচুর। 'ই', 'এফ' এবং 'জি' এই তিনটি গ্রহ অবশ্য আবিষ্কার হয়েছিল গত বছর মে মাসে। বাকি চারটির খোঁজ মিলেছে সম্প্রতি। ট্রপিস্ট নক্ষত্রটির ব্যাস সূর্যের মাত্র ৮ শতাংশ এবং ঔজ্জ্বল্য সূর্যের থেকে ২০০ ভাগ কম। নাসা-র স্পিৎজার স্পেস দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বরং ধরা পড়েছে, ট্রপিস্ট নক্ষত্রটির তুলনায় আকারে অনেকটাই বড়ো পরিবারের অন্য সদস্য গ্রহগুলি। ট্রপিস্ট নক্ষত্রটির আয়তন অনেকটা আমাদের বৃহস্পতির কাছাকাছি। নাসা জানাচ্ছে, খুব শীঘ্রই ওই গ্রহগুলির রাসায়নিক উপাদান, বিভিন্ন গ্যাসের উপস্থিতি, ভূমির প্রকৃতি, আবহাওয়া, পরিবেশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করা হবে।

নতুন এই সাত 'পৃথিবী' রীতিমতো টইটুম্বুর হয়ে আছে জলে। সেই জল বরফ অবস্থায় তো নেই-ই, এমনকী, বরফ-গলা জলও (আইস ওয়াটার) তা নয়। যে তাপমাত্রা পেলে, বায়ুমণ্ডলের যতটা চাপ থাকলে পৃথিবীর সাগর, মহাসাগরের জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে, ঠিক সেই তাপমাত্রা আছে বলেই সদ্য আবিষ্কৃত নতুন সাত 'পৃথিবী'-র জলও রয়েছে একেবারে তরল অবস্থায়। ভূপৃষ্ঠেই (সারফেস ওয়াটার)। জানিয়েছেন নতুন সাত 'পৃথিবী'-র মূল আবিষ্কর্তা বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিশেল গিলন খোদ। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে নাসার সদর দপ্তরে বসে যে ৫ বিজ্ঞানী সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন নতুন সাত 'পৃথিবী'-র আবিষ্কারের খবর, বেলজিয়ামের লিগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূপদার্থবিদ্যা ও সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের এফএনআরএস রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট মিশেল গিলন তাদের অন্যতম।

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে যেভাবে জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর, হয়তো ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতেই আমাদের খুব কাছে থাকা (দূরত্ব মাত্র ৩৯ আলোকবর্ষ) নক্ষত্রমণ্ডল 'ট্রাপিস্ট-১'-এর সদ্য আবিষ্কৃত সাতটি গ্রহ। এখনও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, 'ট্রাপিস্ট-১' নক্ষত্র থেকে অনেক অনেক দূরেই (সূর্য থেকে যতটা দূরত্বে রয়েছে বৃহস্পতি, শনি, নেপচুনের মতো গ্রহগুলি) জন্ম হয়েছিল এই নতুন সাত 'পৃথিবী'-র। নক্ষত্রমণ্ডলের যে-এলাকাকে বলে 'প্রাইমোর্ডিয়াল প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক'। প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক আসলে ঘন গ্যাসের এমন একটা খুব পুরু চাকতি, যেখান থেকে গ্রহ, উপগ্রহের জন্ম হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই বহু দূরের প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর আকারের সাতটি গ্রহ তাদের নক্ষত্রের (ট্রাপিস্ট-১) খুব কাছে এসে গিয়েছিল। সেই দূরত্ব, যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে, 'গোল্ডিলক্স জোন' বা 'হ্যাবিটেবল জোন'। মানে, নক্ষত্র থেকে কোনও গ্রহ যে দূরত্বে থাকলে সেখানে প্রাণের জন্ম হতে পারে বা সেই প্রাণ সহায়ক পরিবেশ পেতে পারে বিকাশের জন্য। আমাদের সৌরমণ্ডলে যেমন মঙ্গল, শুক্র আর পৃথিবী রয়েছে 'গোল্ডিলক্স জোন'-এ। তবে বৃহস্পতি, শনি, নেপচুনের মতো বিশাল চেহারার গ্যাসে ভরা গ্রহ 'ট্রাপিস্ট-১' নক্ষত্রমণ্ডলে আদৌ আছে বলে মনে হয় না। কারণ, অত বিশাল চেহারার গ্রহ তৈরি হওয়ার জন্য যতটা ভারী হতে হয়, ওই নক্ষত্রমণ্ডলের প্রাইমোর্ডিয়াল প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক তত ভারী বা পুরু নয়। 'ট্রাপিস্ট-১' নক্ষত্র আসলে খুবই ঠাণ্ডা নক্ষত্র। যাকে বলে 'বামন নক্ষত্র' বা 'ডোয়ার্ফ স্টার'। আমাদের সৌরমণ্ডল যখন তৈরি হচ্ছে, তখন তার প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক খুব ভারী আর পুরু ছিল বলেই বৃহস্পতি, শনি, নেপচুনের মতো ভারী ভারী বিশাল চেহারার গ্রহগুলি জন্মাতে পেরেছিল।

নতুন সাত 'পৃথিবী'-র আবিষ্কারের ঘোষণার পর পরই মহাকাশে নাসার পাঠানো স্পিৎজার টেলিস্কোপ তো বটেই, মহকাশে থাকা আরও দু'টি সুবিশাল টেলিস্কোপ-হাবল আর কেপলারও নজর রাখতে শুরু করে 'ট্রাপিস্ট-১' নক্ষত্রমণ্ডলের ওপর। আগামী বছর নাসা মহাকাশে পাঠাচ্ছে আরও বড়ো, আরও দক্ষ টেলিস্কোপ। নাম জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জেডব্লিউএসটি)।

এখন নতুন সাত 'পৃথিবী'-র বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া, পরিবেশ, বায়ুমণ্ডলে কী কী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, সে সব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনেকটাই ভাসা ভাসা। এই গ্রহগুলি যে আমাদের পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য হতে পারে, হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটা তারা বলছেন, এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে। আর কিছুটা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আপাতত মনে হচ্ছে, সদ্য আবিষ্কৃত সাতটি গ্রহ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য মুলুকে বাসযোগ্য গ্রহ খোঁজার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের এত দিনের গবেষণার মোড় সত্যি-সত্যিই ঘুরিয়ে দিতে পারে। কারণ, এই গ্রহগুলি যে-দূরত্বে রয়েছে, তাতে বিজ্ঞানীদের হাতে থাকা প্রযুক্তি দিয়ে খুব সহজেই গ্রহগুলির বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া ঠিক ভাবে বুঝে ওঠা যাবে। আরও আশার কথা, এই গ্রহগুলির ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা শূন্য থেকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৩২ ডিগ্রি থেকে ২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে। যে তাপমাত্রায় জল খুব সহজেই তরল অবস্থায় থাকতে পারে। আর প্রাণের জন্ম বা তার বিকাশের পক্ষেও এই তাপমাত্রা একেবারেই আদর্শ। হাবল, কেপলার, স্পিৎজার ও জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের খুব সাহায্য করবে। ফলে আশা করা হচ্ছে, দু'-এক বছরের মধ্যেই এই নতুন সাত 'পৃথিবী' সম্পর্কে অনেক তথ্য হাতে আসবে।

গর্বের বিষয় হল, আলোড়ন ফেলে দেওয়া এই আবিষ্কারের সাথে জড়িয়ে গেছে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর নামও। বেঙ্গালুরু-র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর দেবেন্দ্র কে. সাহু। তার নেতৃত্বেই একদল ভারতীয় বিজ্ঞানী জম্মু-কাশ্মীরের লাদাখে সাড়ে ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় বসানো হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপের (এইচসিটি) ২ মিটার ব্যাসের লেন্সে টানা ৬ ঘণ্টা চোখ লাগিয়ে রেখে নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন এই ব্রহ্মাণ্ডে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির 'অ্যাকোয়ারিয়াস' নক্ষত্রপুঞ্জে থাকা ওই আশ্চর্য সৌরমণ্ডল 'ট্রাপিস্ট-১'-এর অস্তিত্ব। জানাতে পেরেছিলেন, বেলজিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক মিশেল গিলনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক গবেষক দল ওই সৌরমণ্ডলে একটি অসম্ভব রকমের ঠাণ্ডা (আলট্রা-কুল) বামন নক্ষত্রকে (ডোয়ার্ফ স্টার, যার নাম 'ট্রাপিস্ট-১') ঘিরে একেবারে পৃথিবীর আকারের যে তিনটি গ্রহ পাক মারছে বলে অনুমান করছেন, তা একেবারেই সঠিক। আর সেই তিনটি আদ্যোপান্ত পৃথিবীর আকারের ভিনগ্রহ 'ট্রাপিস্ট-১বি', ট্রাপিস্ট-১সি' ও 'ট্রাপিস্ট-১ডি' রয়েছে তাদের নক্ষত্র (ট্রাপিস্ট-১) থেকে ঠিক সেই দূরত্বে, যাকে বলে 'গোল্ডিলক্স জোন'। মানে, কোনও নক্ষত্র থেকে তাকে ঘিরে পাক মারা কোনও গ্রহ যে দূরত্ব থাকলে সেই গ্রহের পিঠেই (সারফেস) জল থাকতে পারে তরল অবস্থায়। আর জল তরল অবস্থায় থাকার মানে, তা প্রাণের হদিশ মেলার সম্ভাবনাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে এই আন্তর্জাতিক গবেষণায়, রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেবেন্দ্র সাহুর নেতৃত্বে লাদাখে টেলিস্কোপে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ। গত ২২ ফেব্রুয়ারি নাসা ঘোষণা করে, এই প্রথম পৃথিবীর মাপে একই সঙ্গে সাতটি গ্রহের হদিশ মিলল, যা পাক মারছে খুব টিমটিম করে জ্বলা একটি বামন নক্ষত্রকে (ডোয়ার্ফ স্টার)। আমাদের থেকে মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে।

মিশেল গিলনের নেতৃত্বে গবেষক দল প্রথম ওই সৌরমণ্ডলের (ট্রাপিস্ট-১) খোঁজ করতে নামেন ২০১১ সালে। ২০১৫-য় তারা চিলিতে বসানো 'ট্রাপিস্ট' টেলিস্কোপ (যার পুরো নাম 'ট্রানজিটিং প্ল্যানেটস অ্যান্ড প্ল্যানেটিসিম্যালস স্মল টেলিস্কোপ) দিয়ে দেখতে পান পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০ আলোকবর্ষ দূরে (২৩৫ ট্রিলিয়ন মাইল) একটি বামন নক্ষত্র রয়েছে 'অ্যাকোয়ারিয়াস' নক্ষত্রপুঞ্জে। যে নক্ষত্রটি জ্বলছে খুব টিমটিম করে। নক্ষত্রটির আঁচ আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক কম। চেহারাতেও সে ক্ষুদ্র। কিন্তু ওই বামন নক্ষত্রটির আলো কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে কেন, তার যথাযথ কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তারা। তাই শরণাপন্ন হন চিলিতেই বসানো আরও একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপ 'ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ' বা 'ভিএলটি'-এর। তাতে তারা দেখলেন, ওই বামন নক্ষত্রটির আলোর বাড়া-কমার কারণ আসলে তাকে ঘিরে পাক মারছে খুব কাছাকাছি থাকা তিন-তিনটি গ্রহ। অবিকল পৃথিবীর মতো। পাথুরে, জলে ভরা। আর সেগুলি রয়েছে তাদের নক্ষত্র থেকে যে দূরত্বে, তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে, 'গোল্ডিলক্স জোন' বা 'হ্যাবিটেব্‌ল জোন'। মানে, যেখানে কোনও গ্রহ থাকলে, সেখানে প্রাণের জন্ম বা বিকাশের উপযোগী তরল জল, বায়ুমণ্ডল ও পরিবেশ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তারা

পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। আসলে সাধারণত, তিন ধরনের টেলিস্কোপ দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখা হয়। একটি দৃশ্যমান আলো বা অপটিক্যাল ব্যান্ডের টেলিস্কোপ। আলোর অন্য দু'টি ব্যান্ডকে চোখে দেখা যায় না। ইনফ্রারেড আর আল্ট্রাভায়োলেট রেঞ্জের এক্স-রে টেলিস্কোপ। চিলির 'ট্রাপিস্ট' টেলিস্কোপটি ছিল ইনফ্রারেড ব্যান্ডের। অধিকতর শক্তিশালী 'ভিএলটি' টেলিস্কোপটি দিয়ে দু'টি ব্যান্ডই দেখা যায়। অপটিক্যাল ও ইনফ্রারেড ব্যান্ড। কিন্তু ওই তিনটি গ্রহ তাদের নক্ষত্রকে একবার পাক মারতে কতটা সময় লাগায় (অরবিট্যাল পিরিয়ড), সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না গিলন ও তার সহযোগী গবেষকরা। কাজেই তারা ভারতের দ্বারস্থ হন। কারণ, এত দিন যে দু'টি টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ওই আশ্চর্য সৌরমণ্ডল আর সেখানে থাকা অবিকল পৃথিবীর চেহারার তিনটি ভিনগ্রহের হদিশ পেয়েছেন, সেই চিলির প্রায় উল্টো দিকের দ্রাঘিমাংশে (লঙ্গিটিউড) রয়েছে ভারতের লাদাখে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার উচ্চতায় বসানো 'হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপ' (এইচসিটি)। এই টেলিস্কোপ দিয়ে অপটিক্যাল ও ইনফ্রারেড ব্যান্ডে কোনও মহাজাগতিক বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায়। 'ভিএলটি'-র তুলনায় এর সুবিধাটা হল, অনেক বেশি উচ্চতায় লাদাখে বসানো রয়েছে এই 'এইচসিটি'। আর যেহেতু এই টেলিস্কোপ দিয়ে অপটিক্যাল ও ইনফ্রারেড দু'টি ব্যান্ডকেই দেখা যায়, তাই চিলির 'ট্রাপিস্ট' টেলিস্কোপের চেয়ে লাদাখের 'এইচসিটি'-র সুবিধা অনেক বেশি। গোড়া থেকেই ওই টেলিস্কোপের মাধ্যমে যাবতীয় পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল এই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাঁধে। তাই গিলনদের দেখা 'ট্রাপিস্ট-১' সৌরমণ্ডলে তিনটি ভিনগ্রহকে ২০১৫-র ২৪ নভেম্বর রাতে টানা ৬ ঘণ্টা ওই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে নিশ্চিত করার কর্মযজ্ঞে নামতে হয় তাদের। প্রথম খুঁতটা ধরা পড়ে 'ট্রাপিস্ট-১বি' গ্রহটির অরবিটাল পিরিয়ডের হিসেবে। গিলন ও তার সহযোগীরা 'ভিএলটি', 'ট্রাপিস্ট' আর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বসানো 'ইউকে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ' দিয়ে পর্যবেক্ষণের পর বলেছিলেন, ওই ভিনগ্রহটির (ট্রাপিস্ট-১বি) অরবিটাল পিরিয়ড ৩.০২ পার্থিব দিন। কিন্তু পর্যবেক্ষণের পর ভারতীয় বিজ্ঞানী দল নিশ্চিত হন যে, ওই ভিনগ্রহটির অরবিটাল পিরিয়ড আদৌ ৩.০২ পার্থিব দিন নয়; সেটা ১.৫১ পার্থিব দিন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার'-এ গিলান ও তার সহযোগী গবেষকদের সঙ্গে দেবেন্দ্র সাহুর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ২০১৬-র মে মাসে। তারা ট্রাপিস্ট-১ নক্ষত্র থেকে তিনটি গ্রহের সঠিক দূরত্বও বলতে পারেন। পরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই নাসার স্পিৎজার স্পেস টেলিস্কোপ ওই সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর আকারের আরও ৪-টি গ্রহের হদিশ পায়। 'ট্রাপিস্ট-১ই', 'ট্রাপিস্ট-১এফ', 'ট্রাপিস্ট-১জি' এবং 'ট্রাপিস্ট-১এইচ'। অনুমান, একেবারে দূরে থাকা 'ট্রাপিস্ট-১এইচ' গ্রহটি হয়তো বরফে ভরা কোনও গ্রহ হতে পারে। আর 'ট্রাপিস্ট-১এফ'-এর বায়ুমণ্ডল হতে পারে অনেকটা আমাদের বৃহস্পতির মতো, গ্যাসে ভরা। তবে বাকি গ্রহগুলি পাথুরে আর জলে ভরা বলেই প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে ভারতীয় এই বিজ্ঞানী দলের।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

অগ্রগতির পথে ভারত

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

শ্রম শনাক্তকরণ সংখ্যা (Labour Identification Number বা LIN)

মূলত দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার "শ্রম সুবিধা পোর্টাল" তৈরি করেছে। প্রথমত, শ্রম বিধি মেনে চলার জন্য একটি "One-stop-shop" সৃষ্টি। এবং দ্বিতীয়ত, এমন এক মঞ্চ তৈরি যার ভাগীদার হতে পারবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত শ্রম বলবৎকরণ সংস্থা। গত ১৬ অক্টোবর, ২০১৪-এ এই পোর্টালটি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান রীতি অনুযায়ী শ্রম ও শ্রম বিধির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন—কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ESIC), কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন (EPFO), মুখ্য শ্রম আয়ুক্ত (কেন্দ্রীয়.) [CLC(C)], খনি সুরক্ষা মহানির্দেশালয় (DGMS) ইত্যাদি নিয়োগকর্তাদের আলাদা আলাদা সংহিতা (Code) ইস্যু করে থাকে। এগুলিকে সরিয়ে তার জায়গায় আনা হচ্ছে এই নতুন 'LIN' বা শ্রম শনাক্তকরণ সংখ্যা। এটি হল নিয়োগকর্তা, কর্মচারী এবং বলবৎকরণ সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগের একটি মাত্র পয়েন্ট। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এই তিন পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কিত রোজকার কাজকর্মে স্বচ্ছতা আসবে। উল্লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য পরিসংখ্যান সমন্বয়িত করার জন্য, যে কোনও শ্রম বিধির আওতায় প্রতিটি পরিদর্শনযোগ্য/পরীক্ষণযোগ্য ইউনিটকে একটি শ্রম শনাক্তকরণ সংখ্যা (LIN) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। পরিদর্শনের রিপোর্ট পেশ, দাখিলা জমা করা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাও মিলবে এই পোর্টাল থেকে। উপরিলিখিত সমস্ত একীভূত পরিষেবা দিতে সক্ষম শ্রম সুবিধা পোর্টালের নাগাল পেতে http://ShramSuvidha.Gov.in এই URL-এ লগ ইন করতে হবে। বিভিন্ন শ্রম বলবৎকরণ সংস্থায় নিবিষ্কিত একটি ইউনিটকে অদ্বিতীয় হিসাবে চিহ্নিত করা হবে এবং তার জন্য একটি মাত্র অদ্বিতীয় 'LIN' বরাদ্দ করা হবে। 'LIN' হল সেই চাবিকাঠি যার দৌলতে সমস্ত পরিষেবা মিলবে। বর্তমানে শ্রম বলবৎকরণ সংস্থাগুলি আলাদা আলাদা নিবন্ধসংখ্যা (Registration Number) প্রদান করে। যেমন—ESIC নিবন্ধসংখ্যা, EPFO সংখ্যা, ঠিকা শ্রমিক (প্রনিয়ম ও বিলোপন) আইন, ১৯৭০-এর আওতায় ইস্যু করা নিবন্ধীকরণ বা লাইসেন্স নাম্বার ইত্যাদি। ধীরে ধীরে LIN এই সব ধরনের নিবন্ধসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবে। আদতে এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে সহজতর করার উদ্দেশ্যই সাধিত হচ্ছে। কারণ, একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে গাদা গুচ্ছের নিবন্ধসংখ্যা ঠিকঠাক রক্ষিত করাটা বেশ ঝঞ্ঝাটের কাজ।

LIN যখন বরাদ্দ করা হবে, তা তথ্যভাণ্ডারে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ইউনিটের প্রতিনিধির ই-মেল এবং মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

এছাড়াও শ্রম বিধিগুলির আওতায় যত ধরনের নিবন্ধীকরণ এবং দাখিলা জমা করার প্রয়োজন পড়ে, শ্রম সুবিধা পোর্টাল একটি মাত্র এক জানালা অন লাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের সেই যাবতীয় সুযোগ করে দেবে। শ্রম বলবৎকরণ সংস্থাগুলির পরিদর্শক বা পরিদর্শনের পর যে রিপোর্ট তৈরি করবেন, এই পোর্টাল থেকে ব্যবসায়ীরা অনলাইনে সেই রিপোর্টও দেখে নিতে পারবেন। কার্য সম্পাদন পন্থাপদ্ধতিকে সহজ-সরল করে তোলা হচ্ছে; নিবন্ধীকরণ ও দাখিলা জমা করার ফর্মকে একীভূত করে ব্যবসা চালানোর উপযোগী এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর দৌলতে সমন্বয়িত ভাবে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম হওয়ায় ব্যবসায়ীরা যেমন গাদা গাদা কাগজ-কলমে আনুষ্ঠানিকতার হাত থেকে ছুট পাবেন;

তেমনি এর দরুন যে খরচখরচা হ'ত সেই ব্যয়েরও সাশ্রয় হবে। অর্থাৎ মোটের উপর ঘুরে ফিরে সেই একই কথা চলে আসে; ব্যবসা করার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে। LIN বরাদ্দ করার বিষয়ে যে সব নিয়োগকর্তা খুব একটা খোঁজখবর রাখেন না; তারা শ্রম সুবিধা পোর্টালের হোমপেজ-এ গিয়ে "Know Your LIN" ট্যাব-এর সাহায্যে LIN জেনে নিতে পারবেন। LIN খুঁজতে গিয়ে EPFO কোড, ESIC কোড, PAN এমন যে কোনও পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণপত্র ব্যবহার করা চলে। এমন কি সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামের অংশবিশেষ ব্যবহার করেও LIN খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

এই পোর্টাল নিম্নলিখিত শ্রম বিধিগুলির আওতায় দাখিলা পেশ করার সুবিধা জোগাবে।

১) মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬

ক) মজুরি প্রদান (খনি) নিয়ম, ১৯৫৬ (ফর্ম ৪-[নিয়ম ১৮ দ্রষ্টব্য])

খ) মজুরি প্রদান (রেলওয়ে) নিয়ম, ১৯৩৮ (ফর্ম ৩-[নিয়ম ১৭ দ্রষ্টব্য])

গ) মজুরি প্রদান (বিমান পরিবহন পরিষেবা) নিয়ম, ১৯৬৮ (ফর্ম ৮-[নিয়ম ১৬ দ্রষ্টব্য])

২) ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮

ক) ন্যূনতম মজুরি (কেন্দ্রীয়) নিয়ম, ১৯৫০ (ফর্ম ৩-[নিয়ম ২১ (৪এ) দ্রষ্টব্য])

৩) ঠিকা শ্রমিক (প্রনিয়ম ও বিলোপন) আইন, ১৯৭০

ক) ঠিকা শ্রমিক (প্রনিয়ম ও বিলোপন) (কেন্দ্রীয়) নিয়ম, ১৯৭১ (ফর্ম ২৪-[নিয়ম ৮১(১) এবং (২) দ্রষ্টব্য])

৪) মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১

ক) মাতৃত্বকালীন সুবিধা (খনি ও সার্কাস) নিয়ম, ১৯৬৩ [নিয়ম ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

৫) বিল্ডিং ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মী (কর্মসংস্থানের প্রনিয়ম ও চাকরির শর্ত) আইন, ১৯৯৬

ক) বিল্ডিং ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মী (কর্মসংস্থানের প্রনিয়ম ও চাকরির শর্ত) কেন্দ্রীয় নিয়ম, ১৯৯৮

৬) বোনাস প্রদান আইন, ১৯৬৫

ক) বোনাস প্রদান নিয়ম, ১৯৭৫ (ফর্ম ডি-[নিয়ম ৫ দ্রষ্টব্য]

৭) আন্তঃরাজ্য প্রব্রজনকারী শ্রমিক (কর্মসংস্থানের প্রবিধান এবং চাকরির শর্ত) আইন, ১৯৭৯

ক) আন্তঃরাজ্য প্রব্রজনকারী শ্রমিক (কর্মসংস্থানের প্রবিধান এবং চাকরির শর্ত) কেন্দ্রীয় নিয়ম, ১৯৮০ (ফর্ম-২৩ [নিয়ম ৫৬(১) এবং (২) দ্রষ্টব্য]

৮) শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭

ক) শিল্প বিরোধ (কেন্দ্রীয়) নিয়ম, ১৯৫৭ (ফর্ম জি ১-[নিয়ম ৫৬এ দ্রষ্টব্য]

আগে নিয়োগকর্তদের কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ESIC) এবং কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন (EPFO)-এর কাছে প্রতি মাসে আলাদা আলাদা দাখিলা পেশ করতে হ'ত। কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম এবং কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠনের জন্য মাসিক বৈদ্যুতিন চালান-তথা-দাখিলা (ECR) এখন একীভূত করে দেওয়া হয়েছে এবং তা শ্রম সুবিধা পোর্টালে একটি জায়গাতেই ফাইল করা যাবে।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

প্রকাশনা বিভাগের নতুন প্রকাশনা

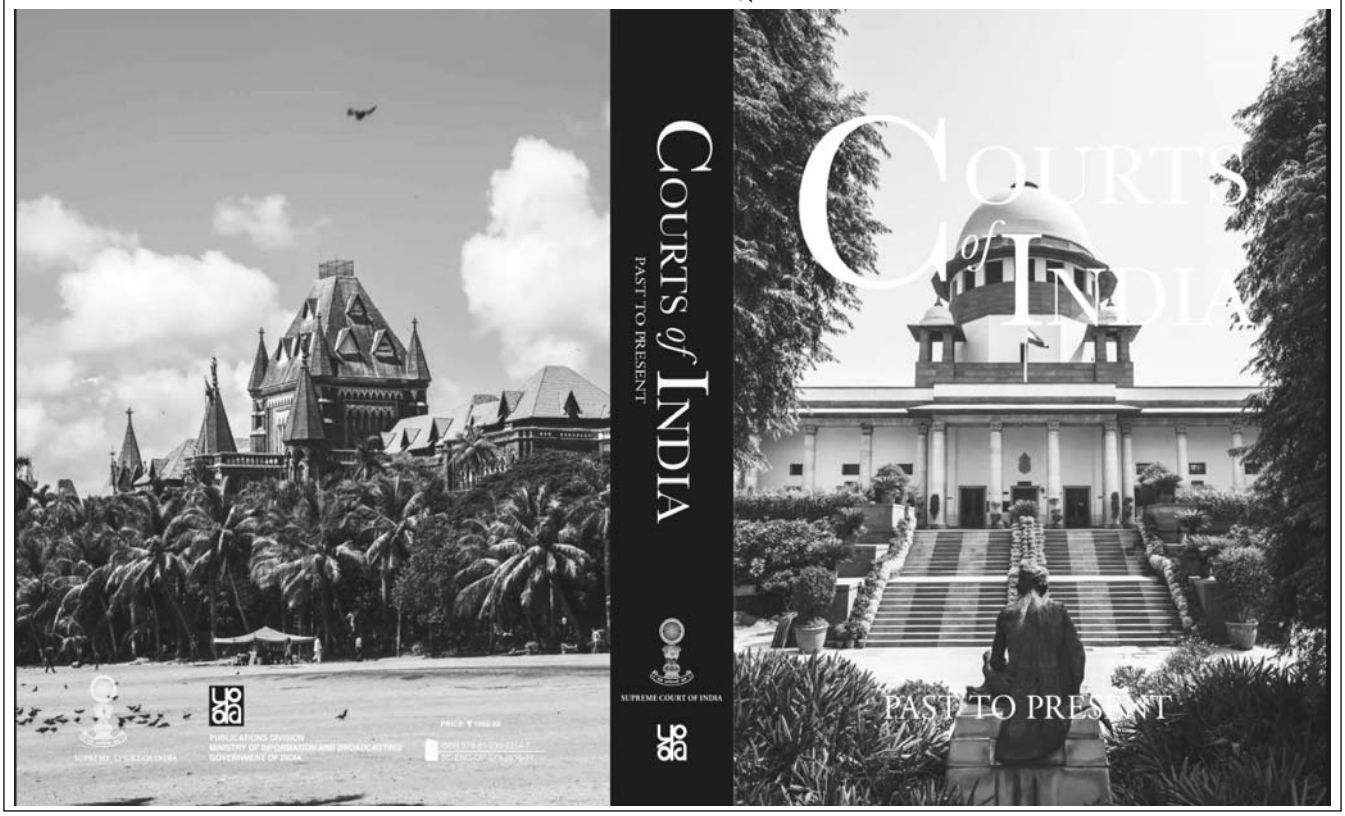

শ্রম বিধি সরল : আর দরকার নেই বিপুল সংখ্যক রেজিস্টার

আমাদের দেশে কৃষি এবং অ-কৃষি; উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বিশদ তথ্য, তাদের বেতন, ঋণ/ঋণ পরিশোধ, হাজিরা ইত্যাদির হিসাবনিকাশ রাখতে গাদা গুচ্ছের রেজিস্টার বা খাতাপত্তর রাখার দরকার পড়ে। কিন্তু সরকার শ্রমিক-কর্মচারী সম্পর্কিত এই সব খাতাপত্র রক্ষণের নিয়ম-বিধি সরল করায় উল্লেখিত উভয় ক্ষেত্রে প্রায় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ সংস্থা এবার এই বাড়তি কাজের হাত থেকে নিস্তার পেল। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে সংস্থাগুলিকে এখন থেকে ৫৬-টির পরিবর্তে মাত্র ৫-টি রেজিস্টার রাখলেই চলবে। ফলে একদিকে যেমন সংস্থাগুলির ব্যয় সংকোচ হবে, অন্য দিকে তেমনি বাড়তি কাজের বোঝাও কমবে। পাশাপাশি, আরও নিপুণভাবে শ্রম বিধি মেনে চলতেও সক্ষম হবে সংস্থাগুলি।

বিবিধ কেন্দ্রীয় শ্রম আইন অনুযায়ী, কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলিকে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যার নিম্নতম সীমার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। ২০১৩-'১৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত দপ্তর (Central Statistical Office) পরিচালিত ষষ্ঠ অর্থনৈতিক আদমশুমার অনুযায়ী, ভারতে কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে মিলিতভাবে মোট ৫.৮৫ কোটি সংস্থার অস্তিত্ব আছে। এর মধ্যে ৪.৫৪ কোটি সংস্থা অ-কৃষি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। চালু নয়টি কেন্দ্রীয় আইনের আওতায় বিভিন্ন রিটার্ন বা বিবরণী/রেজিস্টার/ফর্ম নথিভুক্তির প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে অনেক বাড়তি অনাবশ্যক বিষয় রয়েছে তথা বেশ কিছু বিষয়ের মধ্যে তাল-মেলের অভাব। এগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব।

এবাদেও শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই পাঁচটি সাধারণ রেজিস্টারের জন্য একটি সফটওয়্যার-এর বিকাশের কাজে হাত দিয়েছে। সফটওয়্যারটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের "শ্রম সুবিধা পোর্টাল"-এ দিয়ে দেওয়া হবে। এখান থেকে বিনা পয়সায় প্রয়োজন মতো তা ডাউনলোড করা যাবে। উদ্দেশ্য ডিজিট্যাল ফর্ম-এ এই সব রেজিস্টার অনায়াসে রক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া।

উপরে উল্লিখিত যে নয়টি শ্রম আইনের আওতায় এসব রেজিস্টার রক্ষণ করা হয় সেগুলি হল :

- বিল্ডিং এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মী (কর্মনিয়োগ প্রবিধান এবং চাকরির শর্ত) আইন, ১৯৯৬
- ঠিকা শ্রমিক (প্রবিধান ও বিলোপ) আইন, ১৯৭০
- সম মজুরি আইন, ১৯৭৯
- আন্তঃরাজ্য প্রব্রজনকারী শ্রমিক (কর্মনিয়োগ প্রবিধান এবং চাকরির শর্ত) আইন, ১৯৭৬
- খনি আইন, ১৯৫২
- ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮
- মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬
- বিক্রয় প্রচারকার্য কর্মচারী (চাকরির শর্ত) আইন, ১৯৭৬
- কর্মরত সাংবাদিক এবং অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারী (চাকরির শর্ত) আইন, ১৯৫৫।❑

ছয় কোটি গ্রামীণ পরিবারকে ডিজিট্যাল সাক্ষর করতে উদ্যোগ

গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ছয় কোটি পরিবারকে ডিজিট্যাল মাধ্যমে সড়গড় করে তোলার জন্য "প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিট্যাল সাক্ষরতা অভিযান" (PMGDISHA) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেল। প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ ২,৩৫১.৩৮ কোটি টাকা। মার্চ, ২০১৯-এর মধ্যে গ্রাম ভারতকে ডিজিট্যাল মাধ্যমে সাক্ষর করে তুলতে এই প্রকল্পের সূচনা করা হচ্ছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী চালু করা হচ্ছে প্রকল্পটিকে।

আশা করা হচ্ছে PMGDISHA বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ ডিজিট্যাল সাক্ষরতা কর্মসূচি হতে চলেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-'১৭ অর্থবছরে ২৫ লক্ষ প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে ২৭৫ লক্ষ এবং ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে ৩০০ লক্ষ মানুষকে দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে যাতে দেশের সর্বত্র প্রকল্পটির সুফল পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার পঞ্চায়েতের প্রতিটি থেকে গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণের পর এই সব ডিজিট্যাল সাক্ষর মানুষজন কম্পিউটার তথা ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোনের মতো তথ্যের নাগাল পেতে ব্যবহৃত ডিজিট্যাল সরঞ্জাম ব্যবহারে দড় হবেন। ই-মেল আদান-প্রদান, ইন্টারনেটে অনুসন্ধান, সরকারি পরিষেবার নাগাল, তথ্য খোঁজা, নগদহীন লেনদেন ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে করতে সক্ষম হবেন। তথ্য-প্রযুক্তির এই অনায়াস ব্যবহারের দৌলতে তারা জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রকল্পটির রূপায়ণের কাজের সার্বিক দেখভালের দায়িত্ব বৈদ্যুতিন এবং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের উপর ন্যস্ত। রাজ্য সরকারগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য স্তরীয় রূপায়ণকারী সংস্থা, জেলা বৈদ্যুতিন প্রশাসন সোসাইটি (DeGS) ইত্যাদির মাধ্যমে।❑

যোজনা ডায়েরি

(২১ ফেব্রুয়ারি—২০ মার্চ, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

➢ ডোনাল্ড ট্র্যাম্প ক্ষমতায় আসার পরে আমেরিকায় প্রথম দীর্ঘমেয়াদি দৌত্য ভারতের। চার দিনের আমেরিকা সফরে বিদেশসচিব এস. জয়শঙ্কর। গত ৩ মার্চ নয়া মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এইচ. আর. ম্যাকমাস্টারের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাস নিয়ে সরব হন জয়শঙ্কর। আলোচনায় ওঠে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিবাস কুচিভোটলার হত্যার প্রসঙ্গও। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের স্পিকার পল রায়ানও।

➢ জামাত উদ দাওয়া প্রধান হাফিজ সইদকে গৃহবন্দি করে রাখার ঘটনায় পাঞ্জাব সরকারকে নোটিস পাকিস্তানের লাহোর হাইকোর্ট-এর। গত ৩০ জানুয়ারি হাফিজ ও জামাত উদ দাওয়া এবং ফালাহ ই ইনসানিয়ৎ-এর চার নেতাকে সন্ত্রাস দমন আইনে গৃহবন্দি করে পাকিস্তান। এর বিরুদ্ধে গত ২১ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হাফিজরা। তার প্রেক্ষিতেই ২২ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব সরকারকে লাহোর হাইকোর্ট-এর এই নোটিস।

➢ 'এইচ-ওয়ান-বি' ভিসা আইনে রদবদলের জেরে মার্কিন মুলুকে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। এদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ভারতে আসা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট'স কমিটির বিদেশ বিষয়ক কমিটির তরফে গত ২২ ফেব্রুয়ারি এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত 'এইচ-ওয়ান-বি' ভিসা আইনের জেরে মার্কিন মুলুকে ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে কর্মরত যে সব ভারতীয় কর্মীর চাকরি যাবে, তাদের ইউরোপীয় দেশগুলিতে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এমনকী, পরিবর্তিত ভিসা আইনের জেরে মার্কিন মুলুকে ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলির ব্যবসা চালাতে অসুবিধা হলে, সেই সংস্থাগুলির জন্যও ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট'স কমিটির বিদেশ বিষয়ক কমিটি আরও জানিয়েছে, আগামী দিনে তারা ভারতের সঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে আদান-প্রদানের পরিমাণ আরও বাড়াতে চায়।

➢ আমেরিকার নতুন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে মার্কিন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারবার্ট রেমন্ড ম্যাকমাস্টারকে বেছে নিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্প। পাশাপাশি বিদেশ নীতি উপদেষ্টার পদের দায়িত্বেও থাকবেন ৫৪ বছরের ম্যাকমাস্টার। গত ২০ ফেব্রুয়ারি তার নাম ঘোষণা করেন ট্র্যাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্র্যাম্পের শপথ গ্রহণের ২৪ দিনের মাথায় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে গোপন আলোচনা ও প্রশাসনের কাছে তথ্য গোপনের অভিযোগে এই পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন মাইকেল ফ্লিন। ফ্লিনের পদত্যাগের পরে জেনারেল কিথ কেলগ অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ সামলাচ্ছিলেন। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চিফ অব স্টাফ।

● **আউটসোর্সিং বন্ধ করতে ফের বিল মার্কিন কংগ্রেসে :** আউটসোর্সিং বন্ধ করতে ফের বিল পেশ মার্কিন কংগ্রেসে। যে সব মার্কিন সংস্থা আউটসোর্সিং-এর উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ অন্যান্য দেশে বরাত দিয়ে কম খরচে কাজ করিয়ে নেয়, সেই সংস্থাগুলির উপর খাঁড়া নামিয়ে আনার সংস্থান রয়েছে এই বিলে। মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্য জিন গ্রিন এবং রিপাবলিকান সদস্য ডেভিড ম্যকিনলে যৌথভাবে গত ২ মার্চ বিলটি আনেন। 'ইউএস কল সেন্টার অ্যান্ড কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট' নামে এই বিলে বলা হয়েছে—যে সব মার্কিন সংস্থা নিজেদের সব কাজ বা অধিকাংশ কাজ অন্যান্য দেশে অবস্থিত কল সেন্টার বা অফিস থেকে করিয়ে নেয়, সেই সব সংস্থাকে চিহ্নিত করে 'ব্যাড অ্যাক্টরস' তালিকায় নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। সংস্থাগুলি মার্কিন সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা, আর্থিক সাহায্য এবং ঋণ পাবে না। মার্কিন কংগ্রেসে বিলটি পাস হলে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ভারতের অনেক কল সেন্টারের। আউটসোর্সিং-নির্ভর মার্কিন সংস্থাগুলির উপর আরও বেশ কিছু শর্ত চাপানো হয়েছে এই বিলে। যে সব সংস্থা বিদেশি কল সেন্টারের মাধ্যমে মার্কিন গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে, স্পষ্ট করে জানাতে হবে, কোথায় কল সেন্টারটি অবস্থিত। গ্রাহক যদি সেই কল সেন্টারের সঙ্গে কথা বলতে না চান এবং আমেরিকায় থাকা কোনও প্রতিনিধির সঙ্গে কথা

বলার অনুরোধ করেন, তা হলে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

২০১৩ সালেও এই রকমই একটি বিল পেশ হয়েছিল মার্কিন কংগ্রেসে। তাতেও বলা হয়েছিল, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা মার্কিন গ্রাহককে জানাতে বাধ্য যে কোন দেশে অবস্থিত কল সেন্টারের সঙ্গে গ্রাহক কথা বলছেন। তিনি যদি আমেরিকাস্থিত কোনও প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করেন, সংস্থাকে সে অনুরোধ মানতে হবে। তবে বিলটি তখন পাস হয়নি।

● **সৌদিকে দ্বীপ বিক্রি করতে চায় মালদ্বীপ :**

ভারতের দক্ষিণ সীমান্তের দ্বীপ-রাষ্ট্র মালদ্বীপ সম্প্রতি সৌদি আরবকে একটি দ্বীপ বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফাফু নামক ওই দ্বীপটি মালদ্বীপের বিখ্যাত ২৬-টি রিং দ্বীপের অন্যতম। দ্বীপ কেনার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মালদ্বীপ সফরে যাচ্ছেন সৌদি আরবের রাজা সলমন বিন আবদুল্লাজিজ আল সৌদ। প্রসঙ্গত, আগে বিদেশিরা মালদ্বীপে জমি কিনতে পারত না। কিন্তু ২০১৫-র একটি আইনে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় এখন তা বৈধ।

এত দিন পর্যন্ত ফাফু নামক ওই দ্বীপটির সঙ্গে ৪১ বছরের একটি বন্ড ছিল ইরানের। তবে এই মুহূর্তে এই দ্বীপের ৩০০ জন পড়ুয়াকে স্কলারশিপ দেয় সৌদি। তার মধ্যে ৭০ শতাংশই ওয়াহাবি মতাদর্শের মানুষ। এমনকী এখানকার মাদ্রাসাগুলিতেও সৌদির শিক্ষকরা শিক্ষাদান করেন। মালদ্বীপ প্রশাসন সূত্রে দাবি, ওয়াহাবি মতাবলম্বী মানুষদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

● **ফের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা উত্তর কোরিয়ার :**

কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জের বেঁধে দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করে উত্তর কোরিয়ার উত্তর পিয়নগন প্রদেশ থেকে গত ৬ মার্চ জাপানের দিকে পাঁচটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে কিম জং উনের সামরিক বাহিনী। একটি ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। বাকি চারটি উত্তর কোরিয়ার এক উপকূল থেকে উড়ে অন্য উপকূল পেরিয়ে জাপান সাগর বা পূর্ব সাগরে আঘাত হেনেছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী জাপানের উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত জলভাগ জাপানের "এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন"। উত্তর কোরিয়ার ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে তিনটি সেই জোনের মধ্যেই আঘাত হেনেছে।

ওয়াকিবহাল মহল বলছে, জাপানের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়লেও, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং আমেরিকার জোটকেই আসলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে চেয়েছেন কিম জং উন। সম্প্রতি 'ফোল ঈগল' নামে যৌথ মহড়া চালিয়েছে মার্কিন ও দক্ষিণ কোরীয় সেনা। ফলে পাল্টা কড়া বার্তা দিতে চাইছে পিয়ংইয়ং।

কয়েক সপ্তাহ আগে একইভাবে জাপান সাগরে এসে পড়েছিল উত্তর কোরিয়ার নয়া পুকগুকসং-২ ক্ষেপণাস্ত্র। কূটনীতিকদের মতে, উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন শক্তি প্রদর্শন করতে চাইছেন। ফলে বার বার এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা। তাছাড়া সম্প্রতি মালয়েশিয়ার বিমানবন্দরে তার সৎ ভাই কিম জং নামের খুনের পিছনেও উত্তর কোরীয় শাসকেরই হাত রয়েছে বলে ধারণা কূটনীতিকদের। নাম উত্তর কোরিয়ার একনায়কতন্ত্রের কট্টর সমালোচক ছিলেন। কিম যে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব মানছেন না, সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে তার মিত্র দেশ চিনও।

● **নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিদের সফর :**

নাইজেরিয়া, চাদ, ক্যামেরুন ও নাইজার—এই চার দেশ নিয়ে গঠিত আফ্রিকার সমগ্র চাদ হ্রদ অঞ্চল। এখানকার দু' কোটির বেশি নাগরিক বোকো হারাম সন্ত্রাসের শিকার হয়ে যে সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন, সেদিকে বিশ্বের নজর টানতে সম্প্রতি সফরে যান রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৫ জন দূত। ৩ মার্চ ক্যামেরুন থেকে শুরু হয় তাদের সফর। ৬ মার্চ শেষ হয় নাইজেরিয়ায়। আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছিলেন, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টে ছারখার হয়ে যাবে বোকো হারাম জঙ্গিদের তাণ্ডবের মূল কেন্দ্র উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়া। তার পর পরই রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিদের এই সফর।

২০০৯ সাল থেকে নাইজেরিয়ায় মাথা চাড়া দিয়েছে ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন বোকো হারাম। গত আট বছরে এদের হাতে খুন হয়েছে কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ। গৃহহীন কয়েক লক্ষ। ২০১৪ সালে চিবকের একটি স্কুলে চড়াও হয়ে ২৭৬ জন ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায় জঙ্গীরা। অভিযোগ, অপহৃতদের অধিকাংশকেই যৌন দাসী বানিয়ে রেখেছে তারা। লাগাতার সন্ত্রাস নড়বড়ে করে দিয়েছে তেল সমৃদ্ধ নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামোও। পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে দুর্ভিক্ষ। সন্ত্রাস হোক বা দুর্ভিক্ষ, কোনওটাই সামলাতে পারছে না পঙ্গু প্রশাসন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের হালও তথৈবচ। বেকারত্বে ডুবে রয়েছে যুবসমাজ। মানবাধিকার, বিশেষত নারী সুরক্ষার বালাই নেই। আশ্রয় শিবিরগুলির দুরবস্থার জন্য ত্রাণ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির দুর্নীতি ও স্থানীয় প্রশাসনের কারচুপিকেই মূলত দায়ি করেছে মাইদুগুরির টিচার্স ভিলেজ ক্যাম্পের ১৫ হাজার শরণার্থী।

রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে, সমগ্র চাদ হ্রদ অঞ্চলকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে অন্তত ১৫০ কোটি ডলার অর্থ প্রয়োজন। যার অর্ধেকের বেশিই প্রয়োজন ধুঁকতে থাকা নাইজেরিয়ার জন্য। নয়তো স্রেফ খাদ্যাভাবে মারা যাবেন কয়েক লক্ষ মানুষ।

● **জঙ্গি দমনে পাকিস্তানের তৎপরতা :**

সম্প্রতি সন্ত্রাস রুখতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে পাকিস্তান। ফেব্রুয়ারির শেষে গোটা দেশে নামানো হয় আধা-সামরিক বাহিনী। সবচেয়ে বেশি ধরপাকড় হয় পাঞ্জাবে। অভিযানের নাম 'রাদ-উল-ফসাদ'। মূলত পাক সীমান্তরক্ষী বাহিনী রেঞ্জার্সকেই এই কাজে নামানো হয়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। ডোনাল্ড ট্র্যাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর সেই চাপ তীব্রতর হয়। ইসলামাবাদের উপর চাপ বাড়াচ্ছিল নয়াদিল্লিও। যে কোনও মুহূর্তে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে পাকিস্তান, বুঝে যান নওয়াজ শরিফ। তাই লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সইদকে গত ৩০ জানুয়ারি গৃহবন্দি করে শরিফ প্রশাসন। তার পর থেকেই নওয়াজের উপর খড়্গহস্ত পাকিস্তানের কট্টরবাদী সংগঠনগুলি। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ কেঁপে ওঠে পর পর আত্মঘাতী হানায়। সবচেয়ে বড়ো হামলা হয় পাঞ্জাবের

লাহোর এবং সিন্ধের সেহওয়ানে। এর পরেই পাক সেনার নেতৃত্বে অপারেশন রাদ-উল-ফসাদ শুরু।

পাক সশস্ত্র বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনসের তরফে জানানো হয়, পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে অন্তত ২০০-টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে রেঞ্জার্স। বাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময়ে ৪ জঙ্গির মৃত্যু হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৬০০ জনকে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের অধিকাংশই জামাত-উল-অহরর (জেইউএ) নামে একটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। লাহোরের মল রোডে এবং সেহওয়ানের দরগায় এই সংগঠনটিই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে পাক সেনার দাবি। পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এই অভিযান এখন চলবে বলে ইসলামাবাদ সূত্রের খবর। শুরুতে শুধু রেঞ্জার্সকে ময়দানে নামানো হলেও একে একে সিভিল আর্মড ফোর্সেস, পাক বিমানবাহিনী এবং পাক নৌবাহিনীও অভিযানে নামবে।

● **মেধাসত্ত্ব চুরির দায়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা গুগলের :**

অ্যান্থনি লেভানদাওস্কি। চালকবিহীন গাড়ির প্রায় অসম্ভব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ২০১৩-এ তার নাম ফিরত মার্কিনদের মুখে মুখে। মেধাসত্ত্ব আইন ভেঙে প্রযুক্তি চুরি করার দায়ে সেই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার লেভানদাওস্কির বিরুদ্ধে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মামলা দায়ের করেছে গুগলের 'সিস্টার কনসার্ন'—'ওয়েমো, দ্য অ্যালফাবেট ইঙ্ক'। অভিযোগ, 'অ্যালফাবেট'-এর বহু মূল্যবান মেধাসত্ত্ব চুরি করে তা তার এখনকার সংস্থা 'উবের টেকনোলজিস'-এর হাতে তুলে দিয়েছেন লেভানদাওস্কি। বলা হচ্ছে, ২০১৬-র জানুয়ারিতে 'অ্যালফাবেট'-এর চাকরি ছাড়ার আগে থেকেই তিনি গুগলের গোপন তথ্যাদি, প্রযুক্তি-প্রকৌশলের নকশা, খবরাখবর, আগামী প্রকল্পের ১৪ হাজার ফাইল ডাউনলোড করে সরিয়ে ফেলতে শুরু করেন। আদালতে গুগলের সংস্থা 'ওয়েমো, দ্য অ্যালফাবেট ইঙ্ক'-এর তরফে জানানো হয়েছে, লেভানদাওস্কি ও তার সঙ্গী সাথীদের ওই মেধাসত্ত্ব চুরির 'ডিজিট্যাল ফুটপ্রিন্টস' (তথ্য-প্রযুক্তিগত প্রমাণ) তাদের হাতে রয়েছে। মামলায় লেভানদাওস্কি মূল অভিযুক্ত। প্রসঙ্গত, চালকবিহীন গাড়ির ব্যবসায় এই মুহূর্তে উবেরের সঙ্গে জোর টক্কর চলছে গুগলের।

লেভানদাওস্কি যখন বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই তার স্বপ্ন চালকবিহীন গাড়ির অভিনব প্রযুক্তি উদ্ভাবন। লেজার রশ্মির মাধ্যমে চালকবিহীন গাড়ি চালানোর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য পরে তিনি '৫১০ সিস্টেমস' নামে একটি কোম্পানি তৈরি করেন। সেই সংস্থা বাজারে পিৎজা গাড়িও এনেছিল। লেভানদাওস্কি গুগলের চাকরিতে যোগ দেন ২০০৭ সালে। কিন্তু গুগলের চাকরিতে ঢোকার পরেও নিজের সংস্থা '৫১০ সিস্টেমস'-ও চালিয়ে যান, কোনও রাখঢাক না রেখেই। কিন্তু তখন লেভানদাওস্কির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে '৫১০ সিস্টেমস' কোম্পানিটাই কিনে নেয় গুগল। গুগল ছাড়ার আগেও 'ওটো' নামে একটি কোম্পানি খুলেছিলেন। গুগল ছেড়ে উবেরের চাকরি নিলে উবের সেই 'ওটো' সংস্থাটি ৬৮ কোটি ডলারে কিনে নেয়, গত আগস্টে।

● **প্রশান্ত মহাসাগরে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র মার্কিন নৌসেনার :**

প্রশান্ত মহাসাগরের জল তোলপাড় করে পর পর চারটি সুদীর্ঘ পাল্লার পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল আমেরিকা। মার্কিন নৌসেনাই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই উৎক্ষেপণের কথা জানিয়েছে। যে ব্যালিস্টিক মিসাইল আমেরিকা ছুঁড়েছে, সেগুলি ৭ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরে পরমাণু হামলা চালাতে সক্ষম। ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম ট্রাইডেন্ট টু ডি ফাইভ।

ক্ষেপণাস্ত্রগুলি নিক্ষেপের সঠিক দিনক্ষণ মার্কিন নৌসেনা জানায়নি। বিজ্ঞপ্তিতে শুধু বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসেই ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের অদূরে প্যাসিফিক টেস্ট রেঞ্জ থেকে ট্রাইডেন্ট টু ডি ফাইভ ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ছোঁড়া হয়েছে। সমুদ্রের গভীর থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি জল ফুঁড়ে বাইরে এসে গন্তব্যের দিকে ছুটে গিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। চারটি ক্ষেপণাস্ত্রের সবক'টিতেই মাল্টিপল ইনডিপেনডেন্টলি টার্গেটেবল রি-এন্ট্রি ভেহিকল বা লাগানো ছিল। অর্থাৎ, একটি ক্ষেপণাস্ত্রই এক সঙ্গে অনেকগুলি লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম।

ওহায়ো ক্লাস সাবমেরিন থেকে ছোঁড়া হয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। আমেরিকার যে নিউক্লিয়ার ট্রায়াড (ভূমি, আকাশ ও জলভাগ—এই তিন অবস্থান থেকেই পরমাণু হামলা চালানোর ব্যবস্থা) রয়েছে, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ওয়াহো ক্লাস সাবমেরিন। এই সাবমেরিন সমুদ্রের গভীর থেকে যে কোনও ভূ-ভাগে বা জলভাগে পরমাণু হামলা চালাতে পারে। মার্কিন নৌসেনার হাতে ১৪-টি এই গোত্রের সাবমেরিন রয়েছে। প্রতিটি সাবমেরিনে ২৪-টি করে ট্রাইডেন্ট টু ডি ফাইভ ক্ষেপণাস্ত্র বহন করা সম্ভব। সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে পরমাণু হামলা চালানোর সক্ষমতাই হল নিউক্লিয়ার ট্রায়াডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

● **হাফিজকে 'বিপজ্জনক' তকমা পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর :**

কট্টর সন্ত্রাসবাদী হাফিজ সইদ যে পাকিস্তানের পক্ষেও 'অত্যন্ত বিপজ্জনক', অবশেষে কবুল করল পাকিস্তান। হাফিজ মুম্বই হামলার অন্যতম মূল চক্রী। তাকে বেশ কিছু দিন আগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের খবর, হাফিজ সইদকে সন্ত্রাসবাদ দমন আইনের চতুর্থ তপশিল মোতাবেক লাহোরে গৃহবন্দি করা হয় গত ৩০ জানুয়ারি। যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে হাফিজ-সহ তার সংগঠনের ৩৮ জন সদস্যের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে 'একজিট কন্ট্রোল' (বিনা অনুমতিতে দেশ ছাড়ায় নিষেধাজ্ঞা) তালিকাতেও। হাফিজকে 'গৃহবন্দি' করার খবর গত ২০ ফেব্রুয়ারি জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জানান পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। বলেন, "সইদ আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেশের (পাকিস্তান) বৃহত্তর স্বার্থেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" হাফিজকে নিয়ে আসিফ মুখ খোলার পরই তেড়েফুঁড়ে সরকারের বিরোধিতায় নামে সে দেশের বিরোধী দলগুলি। হাফিজকে গৃহবন্দি করার নির্দেশ দিয়ে এমনিতেই প্রবল চাপের মুখে ছিল নওয়াজ শরিফের সরকার। হাফিজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন

প্রয়োগ নিয়েও চাপান-উতোর চলছিল। শেষে আসিফের এই মন্তব্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।

তবে সইদকে গৃহবন্দি করার পাক-ঘোষণার পর প্রশ্ন উঠেছে, এত দেরি করে কেন? ঘটনা হল, ফেব্রুয়ারি মাসেই পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদী হামলার মোট ৮-টি ঘটনা ঘটেছে। কম করে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। একেবারে হালে সিন্ধু প্রদেশের এক সুফি দরগায় আত্মঘাতী বোমা-হামলায় অন্তত ৮৮ জনের মৃত্যু হয়। হাফিজকে অবশ্য এর আগেও একবার গৃহবন্দি করা হয়েছিল। মুম্বই হামলার পর পরই। ২০০৮ সালের নভেম্বরে। কিন্তু পরের বছরেই পাক আদালতের রায়ে তিনি মুক্ত হয়ে যান। এটা যদি হয় ঘরের বাস্তবতা, তা হলে অন্য দিকটা হল আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সইদের গৃহবন্দি হওয়ার খবর ঘটা করে ঘোষণা করে আমেরিকা ও ইউরোপকে এই বার্তাই দিতে চাইল পাকিস্তান, সন্ত্রাসবাদীদের কোনওভাবেই মদত দেয় না, দিতে চায় না ইসলামাবাদ।

● **বেজিং-এ ভারত-চিন বিদেশমন্ত্রকের শীর্ষ কর্তাদের বৈঠক :**

গত ২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি বেজিং-এ ভারত ও চিনের বিদেশমন্ত্রকের বৈঠক হয়। বৈঠকে যৌথভাবে পৌরোহিত্য করেন ভারতের বিদেশ সচিব এস. জয়শঙ্কর এবং চিনের কার্যনির্বাহী উপ-বিদেশমন্ত্রী ঝাং ইয়েসুই। এই প্রথম ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কোনও কার্যনির্বাহী উপ-বিদেশমন্ত্রীকে আসরে নামাল চিন। বৈঠকে মাসুদ আজহার এবং এনএসজি ইস্যু নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে। তবে এই বৈঠকের বাইরে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং য়ি এবং প্রবীণ চিনা কূটনীতিক ইয়াং জিয়েচির সঙ্গেও জয়শঙ্করের বৈঠক হয়েছে।

প্রসঙ্গত, যতবার রাষ্ট্রপুঞ্জে মাসুদ আজহারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাব আনা হচ্ছে, ততবারই সে প্রস্তাব আটকে দিচ্ছে চিন। মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে 'উপযুক্ত প্রমাণ' দাখিল করার দাবি জানাচ্ছে তারা। ভারত সে প্রসঙ্গে এই বৈঠকে চিনকে জানিয়েছে, মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও প্রমাণ দাখিল করার প্রয়োজন নেই। কারণ ১২৬৭ কমিটি মাসুদের সংগঠন জইশকে ইতোমধ্যেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপ থেকেই প্রমাণিত হয় মাসুদ জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। জইশ-ই-মহম্মদ প্রদান মাসুদ আজহারকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব যে আমেরিকাও রাষ্ট্রপুঞ্জে জমা দিয়েছে এবং সে প্রস্তাবে যে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সমর্থন রয়েছে, সে কথাও উল্লেখ করেন জয়শঙ্কর।

এনএসজি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও প্রধান বাধা চিন। ৪৮ সদস্যের ওই সংগঠনে অধিকাংশ সদস্যই ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে। কিন্তু চিন নারাজ, ফলে সর্বসম্মতি হচ্ছে না এবং ভারতের অন্তর্ভুক্তি আটকে যাচ্ছে। এই বিষয় নিয়েও ভারত-চিন বৈঠকে কথা হয়েছে বলে ভারতের বিদেশ সচিব জানিয়েছেন। চিনের তরফে জানানো হয়েছে যে ভারতের সদস্য পদের আবেদনের বিষয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতামত রয়েছে। সেই বিষয়ে ভারতের মতামত এবং এনএসজি-র অধিকাংশ সদস্যের মতামত চিনের চেয়ে ভিন্ন।

● **আমেরিকাকে টক্কর দিতে আরও এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার বানাচ্ছে চিন :**

দক্ষিণ চিন সাগরে মার্কিন রণতরীর সঙ্গে যুঝতে চিন বানাচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী তিন নম্বর এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার। 'ক্যাটাপাল্ট' প্রযুক্তিতে। প্রকৌশলের গুণগত মানে যা মার্কিন এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ারের সমতুল। চিনের নৌবাহিনীর হাতে আরও একটি এয়ার ক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার এলে শুধু দক্ষিণ চিন সাগরই নয়, বৃহত্তর ভারত মহাসাগরেও চিনের 'দাদাগিরি' বাড়বে বলে দাবি প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের। সে অর্থে, পুরোপুরি যুদ্ধে নেমেছে, এমন এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার এখনও পর্যন্ত একটিও নেই চিনের হাতে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল 'লিয়াওনিং'। জাতে এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার হলেও, সর্বাধুনিক সরঞ্জামের অভাবে সোভিয়েত জমানায় 'সাপোর্ট শিপ' হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পর সেটি কিনে নেয় ইউক্রেন। পরে চিনকে বেচে দেয়। উত্তর-পূর্ব দালিয়ান বন্দরে নিয়ে গিয়ে সেই 'লিয়াওনিং'-কে সর্বাধুনিক করে তোলে চিন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটিকে কোনও যুদ্ধে নামায়নি। তার পর আরও একটি এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার বানিয়েছে চিন। সেটিও নামেনি কোনও পুরোদস্তুর যুদ্ধে। ২০২০ সাল নাগাদ সেটি হাতে আসার কথা চিনা নৌবাহিনীর। যার ওজন প্রায় ৫০ হাজার টন। দু' নম্বর এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ারটিকে (০০১এ) এখন প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় 'লিয়াওনিং'-কে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'গ্লোবাল টাইমস' জানাচ্ছে, তিন নম্বর এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ারটিকে (০০২) বানানোর তোড়জোড়-প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কাজ চলছে সাংহাই বন্দরে। এই ০০২ মডেলের এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ারটি মার্কিন 'ক্যাটাপাল্ট' প্রযুক্তিতে বানানো হলেও, তা 'লিয়াওনিং' এবং '০০১এ' মডেলের এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ারের থেকে একেবারেই আলাদা। দেখতে অবিকল মার্কিন এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ারের মতো। বেশিরভাগ সর্বাধুনিক এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার থেকে যুদ্ধবিমান ছোঁড়া হয় তড়িৎচুম্বকীয় (ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক) ক্যাটাপল্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু স্টিম ক্যাটাপল্ট ব্যবস্থার মাধ্যমেও তা করা যায় কি না, চিন তা পরখ করে দেখছে।

প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারি মাসেই দক্ষিণ চিন সাগরে 'রুটিন অপারেশন' শুরু করে মার্কিন 'এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ'। এদিকে দক্ষিণ চিন সাগরকে অনেক দিন ধরেই তার 'নিজের এলাকা' বলে দাবি করে আসছে চিন। তবে ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও ব্রুনেইয়ের মতো দেশগুলি তা কিছুতেই মানতে না চাওয়ায় দক্ষিণ চিন সাগর একটি 'বিতর্কিত এলাকা' হয়ে উঠেছে।

● **ব্রেক্সিট বিল পাস ব্রিটিশ পার্লামেন্টে :**

ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে যে বিলটি পেশ করেছিলেন, ব্রিটেনের পার্লামেন্টে তা অনুমোদিত হল। গত বছরের ২৩ জুনের গণভোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনকে বেরিয়ে আসার পক্ষে রায় দেয়। সেই প্রক্রিয়া শুরুর জন্য থেরেসা মে সরকারের প্রয়োজন ছিল পার্লামেন্টে সংশ্লিষ্ট বিলটির অনুমোদন। বিলটি সংশোধনের চেষ্টা হয়েছিল ব্রিটিশ

পার্লামেন্টে। কিন্তু হাউস অফ লর্ডস সেই সংশোধনের প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় গত ১৪ মার্চ থেকেই বিলটির আইনে পরিণত হতে আর বাধা রইল না। ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার জন্য লিসবন চুক্তির যে ৫০ নম্বর অনুচ্ছেদটির সংযোজন হয়েছিল ব্রিটিনের সংবিধানে, এবার তা বাতিল করতে পারবে সরকার।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ মার্চ, ভোটাভুটির দিন হাউস অব কমন্সের ভোটে ব্রেক্সিটের প্রথম গেরোটা টপকায় ব্রিটেন। হাউস অব লর্ডস চেয়েছিল প্রস্তাবিত বিলটিতে দু'টি সংশোধনী আনতে। প্রথমত, ব্রেক্সিটের পরেও ব্রিটেনে বসবাসকারী ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত যে কোনও দেশের নাগরিকের অধিকার রক্ষা করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, পরে যদি ইইউ-এর সঙ্গে কোনও চুক্তি করতে হয়, সেক্ষেত্রেও শেষ কথা বলবে পার্লামেন্টই। ভোটের ফলে দেখা গেল, ওই সংশোধনী মানতে রাজি হননি হাউস অব কমন্স-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি। আইনে পরিণত হওয়ার জন্য বিলটি এর পর যায় হাউস অব লর্ডসে। এখানেও সম্মতি পাওয়ায় পার্লামেন্ট-এর অনুমোদনপর্ব সম্পূর্ণ হয়। পরের ধাপে ব্রেক্সিট আইনে সিলমোহর দেবেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তার পর পুরো প্রক্রিয়া শেষ করার ক্ষেত্রে দু' বছর সময় পাবে ব্রিটেন।

এরই মধ্যে জটিলতা বাড়ছে স্কটল্যান্ডের ব্রিটেন ছাড়তে চাওয়া নিয়ে। 'স্বাধীনতা'-র দাবিতে ফের গণভোট চেয়ে ১৪ মার্চই পার্লামেন্টের কাছে আর্জি জানিয়েছেন সেখানকার ফার্স্ট মিনিস্টার। গণভোটে সায় মিললে স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে স্কটল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নেই থেকে যেতে পারে।

● **ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অ্যাটর্নি প্রীত ভারারা বরখাস্ত :**

ভারতীয় বংশোদ্ভূত 'হাই-প্রোফাইল' অ্যাটর্নি প্রীত ভারারাকে পদ থেকে বরখাস্ত করল ট্র্যাম্প প্রশাসন। ভারারা ছিলেন পূর্বতন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনের অ্যাটর্নিদের প্যানেলের অন্যতম। তাকে ইস্তফা দিতে বলেছিলেন ট্র্যাম্প প্রশাসন। কিন্তু ম্যানহাটনের আইনজীবী প্রীত পদত্যাগ করতে চাননি। ফলে গত ১১ মার্চ বরখাস্ত করা হয় তাকে। প্রীতের সঙ্গে ওবামা প্রশাসনের আরও ৪৫ জন আইনি উপদেষ্টাকেও পদত্যাগ করানো হয়। প্রসঙ্গত, অ্যাটর্নিরা যেহেতু রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত হন, তাই প্রশাসন বদলের পরে তাদের পদত্যাগ করাটাই দস্তুর। সেই মোতাবেক ৯৩-এর মধ্যে দেশের ৪৭ জন অ্যাটর্নি পদত্যাগ করেছিলেন আগেই। বাকিদেরও একযোগে ইস্তফা দিতে বলেন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশন্স। ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর বিল ক্লিন্টনও এক দিনে সব অ্যাটর্নিকে সরে যেতে বলেছিলেন। জর্জ ডব্লিউ বুশও তাই। পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করলেন ট্র্যাম্প।

উল্লেখ্য, ২০০৯-এ ভারারাকে নিউ ইয়র্কের সাদার্ন ডিস্ট্রিক্টের অ্যাটর্নি পদে নিযুক্ত করেন বারাক ওবামা। দেশে তো বটেই, আইনজীবী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলেও অতি পরিচিত নাম ভারারা। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্সের পরিচালন পর্ষদে থাকাকালীন তথ্য পাচারের অভিযোগে ২০১২-য় ভারতীয় বংশোদ্ভূত রজত গুপ্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তারই হাত ছিল।

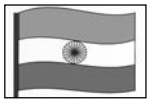

জাতীয়

- ভোট মানচিত্র থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে চলেছে ১১-টি গ্রাম! গত ৮ মার্চ উত্তরপ্রদেশের অন্তিম দফার ভোটে শেষবারের জন্য হাতে কালির ছাপ দিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়ান বারাণসী থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে শোনভদ্র জেলার এগারোটি গ্রামের মানুষ। আর এক মাসের মধ্যেই এখানকার কানহার নদীর উপর বিরাট বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হবে। পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে যেতে হবে চার হাজার গ্রামবাসীকে। বাঁধ তৈরি হলে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকা এবং ঝাড়খণ্ড সীমান্তে কৃষিকাজের অনেকটাই সুরাহা হবে। ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের এই বাঁধের জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। তবে কাজ বিশেষ এগোয়নি তখন। খাতায় কলমে অধিগ্রহণ হলেও গ্রামবাসীরা নির্বিবাদে থেকে গিয়েছেন বাপ-দাদার ভিটেতেই।
- দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মহিলাদের প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় নিখরচায় রান্নার গ্যাস দিতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক বলে জানাল কেন্দ্র। যারা গ্যাস নিতে চান, অথচ আধার নেই, তাদের ৩১ মে-র মধ্যে এই নম্বরের জন্য আবেদন করতে হবে। তাতে নাম নথিভুক্তির পরে সেই স্লিপ নিয়ে গ্যাসের জন্য আর্জি জানানো যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে লাগবে ছবি-সহ ব্যাংক পাসবই, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিচয়পত্রের কোনও একটি। আধার বাধ্যতামূলক হচ্ছে শস্য বিমার জন্যও।
- পরিশুদ্ধ জলের উপর অতিরিক চার্জ নেওয়া যাবে না, দাম নিতে হবে বোতলের গায়ে মুদ্রিত এমআরপি অনুযায়ী, জানাল কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক দপ্তর। একই জলের বোতল একেক জায়গায় একক রকমের দাম। মাল্টিপ্লেক্স বা বিমানবন্দর এমন কি দূরপাল্লার ট্রেনেও পরিশুদ্ধ পানীয় জলের বোতল কিনলে এমআরপি-র থেকে অনেকটাই অতিরিক্ত দাম দিতে হয় মানুষকে। কী কারণে দামের এই হেরফের তার উত্তর অজানা। অবশেষে 'মহার্ঘ্য' পানীয় জলকে সঠিক দামের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু কেন্দ্রের তরফে।
- শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত মামলাটি সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানো হবে কি না, তা নিয়ে গত ২০ ফেব্রুয়ারি নির্দেশ স্থগিত রাখে সুপ্রিম কোর্ট। গত বছরের ১১ জুলাই মামলাটি শুনানির জন্য পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। সব বয়সের মহিলাদের শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা করেছিল আইনজীবীদের একটি সংগঠন।
- শিশু কন্যাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশ জুড়ে এক বিশেষ প্রচার অভিযান শুরু করে চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই)। সংস্থার আশা, এর ফলে প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার শিশু কন্যা তাদের শিক্ষার অধিকার ফিরে পাবে। নয়া

এই উদ্যোগের নাম 'স্কুলের অধিকার'। আর সেই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

➢ এখন থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীরা ২৬ সপ্তাহের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। মাতৃত্বকালীন সুবিধা (সংশোধনী) বিল ২০১৬—রাজ্যসভার পরে গত ৯ মার্চ লোকসভাতেও পাস হল। ১০ বা তার বেশি কর্মী আছেন, এমন সব সংস্থাই এই আইনের আওতায় আসবে। প্রথম দুই সন্তানের ক্ষেত্রে মহিলারা এই সুবিধা পাবেন। তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে ছুটি ১২ সপ্তাহ।

● **পাঁচ রাজ্য নতুন বিধানসভা, বিজেপি-র চার মুখ্যমন্ত্রী, পাঞ্জাবে কেবল কংগ্রেস :**

➢ **উত্তরপ্রদেশ : যোগী আদিত্যনাথ**

১৪ বছর পর উত্তরপ্রদেশের মসনদে ফিরল বিজেপি। গোরক্ষপুর মঠের প্রধান যোগী আদিত্যনাথ গত ১৯ মার্চ শপথ নিলেন দেশের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ, প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশী, দলের তিন প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, বেঙ্কাইয়া নাইডু, নিতিন গডকড়ী ছাড়াও শপথ গ্রহণের মঞ্চে হাজির ছিলেন ১১-টি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। যোগী আদিত্যনাথকে পদ ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ পাঠ করান উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল রাম নাইক। আদিত্যনাথের পরে শপথ নেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য। তিনি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি। দ্বিতীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মাও ওই দিনই শপথ নেন।

যোগী আদিত্যনাথ এবং দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মোট ৪৭ জন মন্ত্রী শপথ নিলেন লখনউ-এর স্মৃতি উপবনে। তাদের মধ্যে ২২ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী। বাকিরা প্রতিমন্ত্রী। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র প্রার্থী তালিকায় এক জন মুসলিমেরও ঠাঁই হয়নি। কিন্তু মহসিন রাজাকে উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সদস্য করল বিজেপি। উত্তরপ্রদেশের নতুন মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেলেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার চেতন চৌহানও। যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে শপথ নেন অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা গঢ়বালের প্রবাদপ্রতিম কংগ্রেস নেতা হেমবতীনন্দন বহুগুণার কন্যা রীতা বহুগুণা যোশী। তিনি লখনউ ক্যান্টনমেন্ট আসন থেকে মুলায়ম সিংহ-এর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ অপর্ণা যাদবকে বিপুল ভোটে হারিয়েছেন।

➢ **উত্তরাখণ্ড : ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়ত**

উত্তরাখণ্ডের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গত ১৮ মার্চ শপথ নিলেন ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়ত। ৭০ আসনের উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় ৫৬-টি এখন বিজেপি-র দখলে। ছাপ্পান্ন বছরে ত্রিবেন্দ্র সিংহ সঙ্ঘের প্রচারক এবং এর আগেও প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছেন। বি. সি. খাণ্ডুরি এবং রমেশ পোখরিয়ালের আমলে রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া রাজ্যের রাজ্যপাল কে. কে. পল শপথ বাক্য পড়ান নতুন মন্ত্রিসভার আরও ন'জন বিধায়ককে। এদের মধ্যে সাত জন মন্ত্রী ও বাকি দু'জন প্রতিমন্ত্রীর পদ পেয়েছেন। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক, যারা বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মন্ত্রী হন সুবোধ উনিয়াল, হরক সিংহ রাওয়াত, যশপাল আর্য, রেখা আর্য এবং সতপাল মহারাজ।

➢ **পাঞ্জাব : ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংহ**

দীর্ঘ ১০ বছর পর পাঞ্জাবের মসনদে ফিরল কংগ্রেস সরকার। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংহ। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শেষে একমাত্র পাঞ্জাবেই সরকার গড়তে পেরেছে কংগ্রেস। গত ১০ বছর পাঞ্জাবে ক্ষমতাসীন ছিল অকালি-বিজেপি জোট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে অনেকগুলি আসন বেশি পেয়ে সরকার গড়েছে কংগ্রেস। আসনসংখ্যার বিচারে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে আপ। বিজেপি-র একাধিক বারের সাংসদ নভজ্যোৎ সিংহ সিধু এবার পাঞ্জাব নির্বাচনের মাসখানেক আগেই কংগ্রেস-এ যোগ দেন। গত ১৬ মার্চ অমরেন্দ্র সিংহ মুখ্যমন্ত্রী পদের শপথ নেওয়ার পর পাঞ্জাবের প্রবীণতম কংগ্রেস বিধায়ক ব্রহ্ম মহীন্দ্রা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর পরই শপথ নেন সিধু। নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী উপস্থিত ছিলেন।

➢ **গোয়া : মনোহর পর্রীকর**

গত ১৪ মার্চ গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন মনোহর পর্রীকর। এর পর ১৬ মার্চ বিধানসভায় তিনি আস্থা ভোটেও জিতে আসেন। ৪০ আসনের গোয়ায় সরকার গড়তে ২১ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। নিজেদের দলের ১৩ জনের পাশাপাশি অন্য ৯ বিধায়কের (মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির ৩, গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির ৩ এবং ৩ জন নির্দল) সমর্থন জোগাড় করে আগেই রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহার কাছে জমা দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু, রাজ্যপাল বিজেপি-কে সরকার গড়তে ডাকার বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যায় কংগ্রেস। ১৭ জন বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও তাদের কেন ডাকা হল না, সেই প্রশ্ন তুলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের কাছে আবেদন জানান গোয়ার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা চন্দ্রকান্ত কাভলেকর। এ নিয়ে জরুরি শুনানির জন্য বিশেষ বেঞ্চ তৈরি করা হয়। শুনানি শেষে কংগ্রেসের আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

➢ **মণিপুর : বীরেন সিংহ**

১৫ মার্চ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এন. বীরেন সিংহ। প্রাক্তন ফুটবলার বীরেন সিংহ কিন্তু আগে কংগ্রেসেই ছিলেন। ২০১৬-র অক্টোবরে তিনি বিজেপি-তে যোগ দেন। মণিপুরে বিজেপি-র সে সময় বিধানসভায় প্রতিনিধিত্বও ছিল না। কিন্তু চমকে দিয়ে সেই বিজেপি-ই এবার ৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভায় ২১-টি আসন দখল করে। কংগ্রেস ২৮-টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হয় এবারও। কিন্তু নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা কংগ্রেসও পায়নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই দ্রুত মণিপুরের ছোটো দলগুলিকে কাছে টানে

বিজেপি। এনপিএফ-এর ৪ এবং এনসিপি-র ৪ বিধায়ক বিজেপি-কে সমর্থনে রাজি হন। কেন্দ্রে বিজেপি-র সহযোগী রামবিলাস পাসোয়ানের এলজেপি ১-টি আসন পেয়েছে। তিনিও স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি-র দিকে থাকেন। কিন্তু এই ৯ বিধায়ককে মিলিয়ে ৩০-এ পৌঁছচ্ছিল বিজেপি। ম্যাজিক ফিগার ৩১। এই পরিস্থিতিতে মণিপুরের একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক এবং কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসা আর এক বিধায়ক বিজেপি-র পাশে দাঁড়ায় এবং এই গোটা বন্দোবস্তই সেরে ফেলা হয় মণিপুরে ভোটের ফল প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। ৩২ জন বিধায়কের সমর্থনের চিঠি বিজেপি-র সঙ্গে থাকায় বিজেপি-কেই সরকার গড়তে ডাকেন রাজ্যপাল নাজমা হেপতুল্লা।

এর পর ২০ মার্চ মণিপুর বিধানসভায় আস্থাও অর্জন করে বিজেপি। ৬০ আসনের বিধানসভায় ৩২-টি ভোট পান মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংহ। ফলে সিলমোহর পড়ল মণিপুরের প্রথম বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের স্থায়িত্বে।

- **পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, বিজেপি হাওয়ায় কুপোকাত বিরোধীরা :**

শুরু হয়েছিল ৪ ফেব্রুয়ারি। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দীর্ঘপর্ব শেষ হল ৯ মার্চ। ফল বেরোল ১১ মার্চ। ৪ ফেব্রুয়ারি এক দফায় ভোট হয় পাঞ্জাব ও গোয়ায়। উত্তরাখণ্ডেও এক দফায়—১৫ ফেব্রুয়ারি। মণিপুরে প্রথম দফার ভোট হয় ৪ মার্চ। ৯ মার্চ সেখানে ছিল দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোট। দীর্ঘ ভোটযজ্ঞের নিউক্লিয়াস ছিল দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। সেখানে ভোট হয় সাত দফায়।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি তথা মোদী ঝড়ে স্রেফ খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে অখিলেশ-রাহুল গান্ধী-মায়াবতীরা। এককভাবে কোনও রাজনৈতিক দলের এমন জয় এর আগে মাত্র দু'বার দেখেছে উত্তরপ্রদেশ। প্রথমবার ১৯৫১-'৫২ এবং তার পর ১৯৭৭-এ। ফের ৪০ বছর পর এবার এককভাবে কোনও দল ৩০০ আসনের দরজা পেরোল। অন্য দু'বারের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিন্তু কোনও মিল নেই। ১৯৫১-'৫২-তে প্রথমবার দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ সদ্য স্বাধীন হওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে কংগ্রেস-আবেগ তখন চরমে। সেই সময় উত্তরপ্রদেশে মোট আসন ছিল ৪৩০-টি। এর মধ্যে কংগ্রেস এককভাবে ৩৮৮-টি আসন পায়। এর পর ১৯৭৭ সাল। এক্ষেত্রেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছিল। দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করার পরেই সেই সময় নির্বাচনে গিয়েছিল কংগ্রেস। সেবার উত্তরপ্রদেশে মোট আসন ছিল ৪২৫। সেই সময় কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া বইছে দেশ জুড়ে। সেবার উত্তরপ্রদেশে জনতা দল পেয়েছিল ৩৫২-টি আসন। একা দলের তিনশো পেরনোর গল্প সেখানেই শেষ। এবার ৪০৩-টি আসনের মধ্যে বিজেপি এককভাবে ৩১১-টি আসন পেয়েছে।

বিজেপি এবার বোনাস হিসেবে উত্তরাখণ্ডেও নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। ৭০ আসনের উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৩৬-টি আসন। ২০১২-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সামান্য ব্যবধানে পিছনে ফেলে সে রাজ্যের দখল নিয়েছিল কংগ্রেস। এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কোনও চিহ্ন মেলেনি পাহাড়ি রাজ্যে। ৭০-টি আসনের মধ্যে ৫৭-টি আসন বিজেপির দখলে। কংগ্রেস ১১-টি আসন ও অন্যান্যরা ২-টি আসনে জয়ী। মুখ্যমন্ত্রী হরীশ রাওয়াত হরিদ্বার গ্রামীণ এবং কিছা—এই দু'টি আসন থেকে লড়াই করে দু'টিতেই হেরেছেন।

তবে উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা বিজেপির বিজয়রথ থেমে যায় পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবে ত্রিমুখী লড়াইয়ে নেমেছিল বিজেপি, কংগ্রেস ও অরবিন্দ কেজরীবালের দল আপ। গত দশ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা শিরোমণি আকালি দল ও বিজেপি-র জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ছিল তীব্র। কিন্তু দাগ কাটাতে পারেনি আপ-ও। ১১৭ সদস্যের পাঞ্জাব বিধানসভায় কংগ্রেস ৭৭-টি আসন দখল করে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। আপ ২০ এবং বিজেপি জোট মাত্র ১৮।

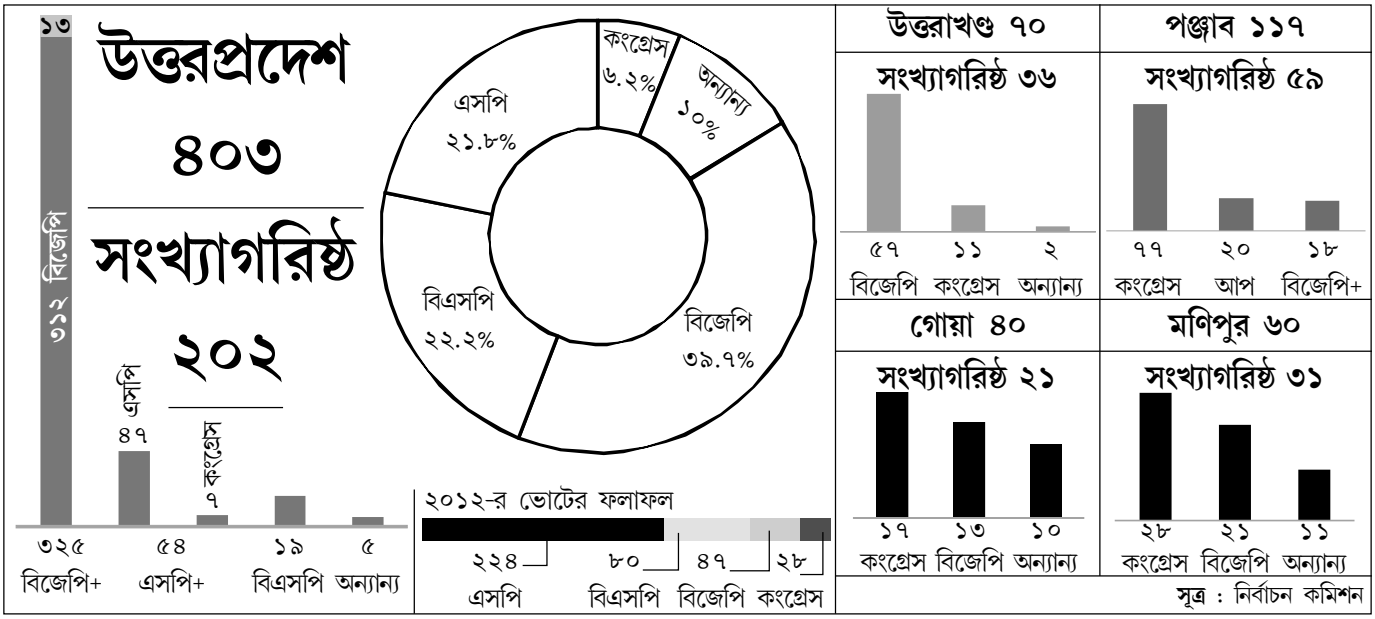

গোয়া এবং মণিপুরে বলা যেতে পারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। ৬০ সদস্যের বিধানসভায় মণিপুরে ২৮-টি আসনে জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কংগ্রেস। ত্রিশঙ্কু ফলে মণিপুরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাভাষী বিধায়ক আসাবউদ্দিন এবং বাংলার দল তৃণমূলের একমাত্র বিধায়ক থঙ্গার টি. রবীন্দ্র সিংহ। বিজেপি-র হাতে রয়েছে ২১-টি আসন। যৌথ মঞ্চ নেডার শরিক দলগুলির হাতে ৯-টি।

এত দিনের 'দেবী'-কে কার্যত মাটিতে আছড়ে ফেলেছে মণিপুরের মানুষ। অনশন ভাঙার পর থেকেই রাজনীতিতে নাম লেখানো ইরম শর্মিলার বিপক্ষে চলে গিয়েছিল মণিপুরের একটা বড়ো অংশ। বিশেষ করে এত দিনের সঙ্গী 'ইমা'-রা (মা) ও 'মেইরা পইবি' (মহিলা সংগঠন)। থৌবালের মানুষ শর্মিলাকে ভোট দেওয়ার থেকে 'নোটা'-র বোতাম টেপাই বেশি শ্রেয় মনে করেছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়তে নেমে শর্মিলা মাত্র ৯০-টি ভোট পেলেন। মুখ্যমন্ত্রী ওক্রাম ইবোবি সিংহ জিতলেন সবচেয়ে বেশি ১০,৪৭০ ভোটের ব্যবধানে। থৌবাল কেন্দ্রে জয়ী মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন ১৮,৬৪৯-টি ভোট। নোটায় পড়েছে ১৪৩-টি ভোট। এই ফলের জেরে শর্মিলার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তার আরও দুই সঙ্গী মানবাধিকার কর্মী নাজিমা বিবি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রাক্তন কর্মী ইরেন্দ্র লেইচম্বামাও হেরেছেন। কবরের মাটি না মেলার ফতোয়া অগ্রাহ্য করে লড়া নাজিমা মাত্র ৯-টি ভোট পেয়েছেন।

অন্যদিকে ৪০ আসনের গোয়া বিধানসভায় সরকার গড়তে ম্যাজিক সংখ্যা হল ২১। কংগ্রেস ১৭ আসনে জিতে একক বৃহত্তম দল। বিজেপি ১৩, মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি ৩, গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি ৩ আসনে জিতেছে। এছাড়াও ৩ জন নির্দল বিধায়কও জিতেছেন।

● **শত্রু সম্পত্তি বিল পাস লোকসভাতেও :**

পাঁচ বার আনা হয়েছিল অধ্যাদেশ। পঞ্চম অধ্যাদেশের মেয়াদ শেষের দিনে লোকসভায় পাস হল নয়া শত্রু সম্পত্তি বিল। ফলে স্থায়ীভাবে পাকিস্তান ও চিনে চলে যাওয়া ভারতীয়দের সম্পত্তিতে তাদের বংশধরদের আর কোনও অধিকার রইল না। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পরে পাকিস্তান ও চিনে যাওয়া ভারতীয়দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ভাবনা শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে পাস হয় 'শত্রু সম্পত্তি আইন'। ওই সম্পত্তি দেখাশোনার ভার যায় কেন্দ্রের 'কাস্টোডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টিজ'-এর হাতে। কিন্তু ওই আইনের কিছু দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন রাজা মেহমুদাবাদের বংশধররা। উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে রাজা মেহমুদাবাদের বেশ কিছু সম্পত্তি রয়েছে। ফলে শেষপর্যন্ত আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

নয়া বিল লোকসভায় পাস হয়ে যায়। কিন্তু সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ মেনে বিলে কিছু সংশোধন-সহ গত ১০ মার্চ ফের রাজ্যসভায় পেশ করলে বিরোধীশূন্য সভায় শত্রু সম্পত্তি আইনের সংশোধনী বিলটি ধ্বনি ভোটে পাস হয়। ফলে নিয়ম অনুযায়ী ফের বিল লোকসভায় আনতে হয় সরকারকে। শেষপর্যন্ত গত ১৫ মার্চ লোকসভায় পাস হয়েছে বিলটি।

● **৫৬ বছরের যাত্রায় ইতি, অবসরে আইএনএস বিরাট :**

গত ৬ মার্চ বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ বিরাট-কে 'ডিকমিশনড' করার কথা ঘোষণা করে ভারতীয় নৌসেনা। বিকেল ৫-টা নাগাদ মুম্বই ডক ইয়ার্ডে তার কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ভারতীয় নৌসেনা প্রধান সুনীল লাম্বা। উপস্থিত ছিলেন ৩০ বছর ধরে আইএনএস বিরাটের সঙ্গে কাজ করা মোট ২২ জন কম্যান্ডারের মধ্যে ২১ জন।

ভারতীয় নৌসেনার এই যুদ্ধজাহাজকে রণতরী বংশের বৃদ্ধা ঠাকুরমা বলা হয়। কারণ বিশ্বে এত পুরনো কোনও যুদ্ধজাহাজ বাহিনীর হয়ে কাজ করছিল না। ৫৬ বছরের কেরিয়ার। প্রথমে ১৯৫৯ থেকে ১৯৮৪ সাল, ২৭ বছর ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিতে। ফকল্যান্ড যুদ্ধে আর্জেন্তিনাকে ব্রিটিশদের ঘোল খাওয়ানো এই যুদ্ধ জাহাজে চেপেই। তখন নাম ছিল হার্মেস। ১৯৮৭-তে ভারতীয় নৌসেনার হাতে এসে নাম হল বিরাট। আক্ষরিক অর্থেই বিরাট এই যুদ্ধ জাহাজের ওজন ২৭,৮০০ টন। বুকে যুদ্ধ বিমান-কপ্টার নিয়ে যে ৫,৮৮,২৮৮ নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিয়েছে, তাতে ২৭ বার এই পৃথিবী পাক খেয়ে আসা যায়। বিরাটের বুক থেকেই দিনের পর দিন আকাশে ডানা মেলেছে সি হ্যারিয়ার্সের মতো যুদ্ধ বিমান, সি-কিং, চেতকের মতো হেলিকপ্টার। গত ৬ মার্চ ইতি পড়ল সেই যাত্রায়। সূর্যাস্তে মুম্বই ডক ইয়ার্ডে বিরাটের বুকে উড়তে থাকা নৌসেনার পতাকা শেষবারের মতো নামিয়ে আনা হল। ১৯৮৯-এ শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনার 'পিসকিপিং মিশন'-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বিরাট। ২০১১-র সংসদ হামলার পরে 'অপারেশন পরাক্রম'-এও আরবসাগরে ঢেউ তুলেছিল সে। কিন্তু ইদানীং জলে নামালে কাজের থেকে খরচ হ'ত বেশি।

বিরাটের ভবিষ্যৎ কী? উপকূলবর্তী রাজ্যগুলির কাছে কেন্দ্র জানতে চেয়েছিল, কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না? অন্ধ্রের চন্দ্রবাবুর প্রস্তাব, বিরাটকে বিশাখাপত্তনমে নিয়ে এসে বিলাসবহুল হোটেল তৈরি করতে চান। সঙ্গে জাদুঘর। সমস্যা হল, এতে খরচ হবে ১০০০ কোটি টাকা। যার অর্ধেক কেন্দ্রের কাছেই চাইছেন চন্দ্রবাবু। নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল এস. লাম্বার প্রস্তাব, বিরাটকে কোনও উপকূলের কাছে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। ডুব দিয়ে দেখবে সবাই। তার আগে চার-ছ'মাস ধরে বিরাটের শরীর থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও যোগাযোগের সরঞ্জাম খুলে নেওয়া হবে। কিছুই না হলে বিরাটের গতি হবে গুজরাতের অলং, জাহাজ ভাঙার কারখানায়। আইএনএস বিক্রান্তের ভাগ্যেই তাই ঘটেছিল। সে অবশ্য অন্য রূপে ফিরে এসেছে। বাজাজ সংস্থা ভি১৫ বাইক বাজারে ছেড়ে জানিয়েছে, বিক্রান্তের ধাতুতেই তৈরি এই বাইক। বিরাটের ভাগ্য এখন প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হাতে।

● **মাওবাদী যোগ, যাবজ্জীবন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের :**

নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকা ও জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপে ইন্ধন জোগানোর অপরাধে অন্য চার জন-সহ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. এন. সাইবাবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে সাইবাবা ছাড়াও রয়েছেন হেম

মিশ্র নামে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির এক পড়ুয়া ও প্রশান্ত রাহি নামে এক প্রাক্তন সাংবাদিক। আদালত জানায়, দেশদ্রোহের অভিযোগে ইউএপিএ-র ১৩, ১৮, ২০, ৩৮ এবং ৩৯ নম্বর ধারায় সাজা হয়েছে সাইবাবা এবং তার সহযোগীদের।

ভারতীয় দণ্ডবিধির অবৈধ কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন মোতাবেক ৪৯ বছর বয়সী অধ্যাপক সাইবাবা-সহ মোট পাঁচ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় গাডচিরোলি আদালত। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা রামলাল আনন্দ কলেজের অধ্যাপক সাইবাবার আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তারা আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে আপিল করবেন। বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ তার জামিনের আর্জি খারিজ করে দেওয়ার পর অধ্যাপক সাইবাবা দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের।

বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাওবাদী নথিপত্র, হার্ড ডিস্ক ও পেন ড্রাইভ উদ্ধার হওয়ায় ২০১৩-এ গ্রেপ্তার হন হেম ও প্রশান্ত। সেই সূত্র ধরেই ২০১৪ সালের মে মাসে মহারাষ্ট্র পুলিশ দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি ইউনিভার্সিটির রামলাল আনন্দ কলেজের অধ্যাপক সাইবাবাকে। জেলে শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে, এই আর্জি জানানোয় গত বছরের জুনে তার জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। ২০১২ সালে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে নিষিদ্ধ একটি মাওবাদী সংগঠনের সম্মেলনেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি এমন কাজে যুক্ত ছিলেন যা বহু মানুষের প্রাণ কেড়েছে। অতএব প্রতিবন্ধী হলেও আদালত তার শাস্তির পরিমাণ কমায়নি।

● **গোবর এবং গোমূত্র গবেষণায় ডি-লিট মোহন ভাগবতকে :**

গোবর এবং গোমূত্র-অর্থনীতি নিয়ে কাজ করে ডি-লিট পেলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। নাগপুরের মহারাষ্ট্র অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্স ইউনিভার্সিটি গত ৯ মার্চ তাকে এই সম্মান দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের বক্তব্য, গোশালা স্থাপন ও তার অর্থকরী দিকটি নিয়ে কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আরএসএস প্রধান। নাগপুরের পশু চিকিৎসা কলেজের স্নাতক ভাগবতের কাজের বিষয়টি হল—শুধুমাত্র দুধ নয়, গরুর অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের উপরেই মূল অর্থনৈতিক ভিত পোক্ত হয় গোশালাগুলির। এ নিয়ে একাধিক বইও রয়েছে তার। আরএসএস প্রধান যেমন, গোবর ও গোমূত্রের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্য নিরুপণ করেছেন, তেমনই সবিস্তার বর্ণনা করেছেন মানব শরীরে গোমূত্রের নানাবিধ উপকারিতা। পরিমিত গো-সূত্র সেবন যে বলবর্ধক, সে কথাও কারণ-সহ উল্লেখ রয়েছে তার কাজে। বলা হয়েছে, গোমূত্র সেবনে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়, কমে কিডনিজনিত সমস্যা এবং বাতের ব্যথাও। ডি-লিটের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ভাগবতের নাম প্রস্তাব করে মহারাষ্ট্রেরই একটি সংস্থা।

● **সমান টাকা দিয়ে রেল প্রকল্পে সঙ্গী ঝাড়খণ্ড :**

দেশের জীবনরেখা নামে পরিচিত রেলওয়ে; তার বিভিন্ন কাজে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিটি রাজ্যকে সঙ্গে চায় কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ এ পর্যন্ত তাতে সাড়া না দিলেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে পড়শি ঝাড়খণ্ড। ওই রাজ্য এবং রেলের যৌথ অংশীদারিতে রাঁচি থেকে টোরি পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন পাতার কাজ শেষ করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথ তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৬৮২ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৩২৮ কোটি টাকা দিয়েছে ঝাড়খণ্ড সরকার।

রেলের ভাঁড়ার তলানিতে। তাই নতুন লাইন পাতার প্রতিটি প্রকল্প এখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগাভাগির ভিত্তিতে রূপায়ণ করতে চাইছে রেল মন্ত্রক। তারা এই ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে রেলের বিভিন্ন প্রকল্পে যোগ দিতে আমন্ত্রণও জানিয়েছে অনেকবার। ইতোমধ্যে সাত-আটটি রাজ্য তাতে রাজিও হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের এই নতুন লাইন সেই যৌথ উদ্যোগের ফল।

রাঁচি থেকে লোহারডাগা পর্যন্ত ন্যারোগেজ লাইন ছিল। সেটিকে প্রথমে ব্রজগেজ লাইনে রূপান্তরিত করা হয়। পরে সেটিকেই বাড়িয়ে আরও ২৯.৫ কিলোমিটার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় টোরি পর্যন্ত। নতুন এই লাইন তৈরির ফলে রাঁচি থেকে দিল্লির দূরত্ব প্রায় ১১৫ কিলোমিটার কমে গেল।

● **স্কুল অধিগ্রহণ বিল পাস অসমে :**

দীর্ঘ আলোচনা, ভোটাভুটির পর অসমে ব্যক্তিগত স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ নিয়ে সরকারের নতুন বিল পাস হল বিধানসভায়। বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন, গত ১১ মার্চ ওই বিল নিয়ে আলোচনা হয়। সরকার জানায়, হাইকোর্ট ২০১১ সালের অধিগ্রহণ আইন বাতিল করায় ২,৮৮৯-টি নিম্ন প্রাথমিক, ৩,১৩৮-টি উচ্চ প্রাথমিক, ৫৮১-টি মাধ্যমিক স্কুল, ১৬২-টি মাদ্রাসা মিলিয়ে মোট ৬,৬০৮-টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৩,৬৬৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অধিগ্রহণ বাকি। অধিগ্রহণের যোগ্যতা থাকা স্কুল, মাদ্রাসা, টোলগুলি অধিগ্রহণ করা হলে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত প্রায় ৮০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। তা মেটাতে বসানো হবে কর, উপকর, টোল, শিক্ষা-সেস। ১০ হাজার স্কুলকে মিলিয়ে দেওয়া হবে। অগপ, কংগ্রেস ইত্যাদি বিরোধী দল বিলের বিভিন্ন দফা নিয়ে আপত্তি জানায়।

শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান ওই দিন বিল পাস না হলে হাইকোর্ট ৬ মাসের মধ্যে নয়া আইন আনতে যে নির্দেশ দিয়েছে তা আটকে যাবে। আইন লাগু হলে পরে সংশোধনী আনার সংস্থান থাকছে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী। এর পরও বিরোধীরা আপত্তি প্রত্যাহার না করায় ভোটাভুটি হয়। বিজেপি বিধায়কদের সংখ্যা বেশি থাকায় আপত্তি খারিজ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বিলটি পাস হয়।

বিলে বলা হয়েছে, ২০০৬-এর পরে তৈরি স্কুল-কলেজ অধিগ্রহণের আওতায় থাকবে না। স্কুল-কলেজকে সরকারি হতে হলে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিধি ও শিক্ষণ পরিকাঠামো থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নামে জমি হতে হবে। সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করতে হবে। থাকতে হবে অন্তত ৩০ ছাত্র। তিন বছরে শিক্ষান্ত পরীক্ষায় বসা ছাত্রদের মধ্যে ৩০ শতাংশকে উত্তীর্ণ হতে হবে। গত বছরের শিক্ষান্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হবে অন্তত ১০। সব আবশ্যিক বিষয়ে শিক্ষক থাকতে হবে।

● **শুরু আইনি ডিগ্রি যাচাই প্রক্রিয়া :**

ভুয়ো ডিগ্রির জেরে গদি হারাতে হয়েছিল দিল্লির প্রাক্তন আইনমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ তোমরকে। তার জেরে দেশের সব আইনজীবীর ডিগ্রি আসল কি না, তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া। এই কাজ শুরু করার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল বার কাউন্সিল। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পরে কাজ শুরু হয়েছে। বারের সদস্যদের নাম পাঠানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ আইনজীবীর ডিগ্রি আসল কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বার কাউন্সিলের কাছে ফি চেয়ে বসেছিল। অন্তত ৬০ কোটি টাকা খরচ হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফি মেটাতে। ফলে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয় বার কাউন্সিল। শীর্ষ আদালত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ডেকে পাঠায়। বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ ও বিচারপতি রোহিনতন ফালি নরিম্যানের বেঞ্চ-এ আইনজীবী কে. কে. বেণুগোপাল যুক্তি দেন, এত খরচ বহনের ক্ষমতা বার কাউন্সিলের নেই। আর্জি শুনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ফি মকুবের নির্দেশ দেন বিচারপতিরা।

● **অসম সীমান্তে দ্বিতীয় সুরক্ষা বলয় :**

সীমান্তে অসামাজিক কাজ বন্ধ করতে 'সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স'-কে শক্তিশালী করে তুলছে অসম সরকার। অসমের ধুবড়ি, কাছাড়, মানকাছাড় এবং করিমগঞ্জ জেলায় থাকা 'সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স'-এর সীমান্ত চৌকিতে জওয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। এই চারটি জেলার মধ্যে সব থেকে বেশি চৌকি তৈরি হচ্ছে করিমগঞ্জেই। কারণ করিমগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাংলাদেশের প্রায় ১১৫ কিলোমিটার সীমান্ত। তাই করিমগঞ্জে ১৪-টি সীমান্ত চৌকি স্থাপন করা হচ্ছে।

সীমান্তের প্রথম লাইনে রয়েছে বিএসএফ। দ্বিতীয় লাইনে থাকবে অসম পুলিশের জওয়ানরা। মাসের ১০ দিন সীমান্তে বিএসএফ-এর সঙ্গে যৌথ প্রহরা দেবে এই জওয়ানরা। আর বাকি দিনগুলিতে সীমান্ত থেকে খানিকটা দূরে প্রহরার দায়িত্বে থাকবে তারা। করিমগঞ্জ জেলার লাতু, গিরীশগঞ্জ, বুবড়িঘাট, জগন্নাথি, করিমগঞ্জ শহর, মালুয়া, সেরালিপুর, চরগোলা, কুকিতল, কলকলিঘাট-সহজাড়াপাতাতে স্থায়ী পোস্ট ও পেট্রোল পোস্ট থাকবে। ১৭৯ জন জওয়ান ও আধিকারিককে করিমগঞ্জে নিযুক্ত করা হয়েছে।

● **যৌন অপরাধীদের তালিকা প্রকাশ করবে কেরল সরকার :**

দেশে এমন পদক্ষেপ এই প্রথম। যৌন নির্যাতনের অভিযোগে আগে যাদের শাস্তি হয়েছে, এখন যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের নাম-ধামের একটি তালিকা বানিয়ে সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে কেরল সরকার। কেরলের রাজ্যপাল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পি. সথাশিবম গত পয়লা মার্চ রাজ্য বিধানসভায় এ কথা জানান। রাজ্যের চতুর্দশ বিধানসভার চতুর্থ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যপাল বলেন, ওই তালিকায় রাজ্যের যৌন নির্যাতনকারীদের নাম-ধাম, ঠিকানা-সহ তাদের খুঁটিনাটি বিবরণ জানিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের মানুষ যাতে এই সব তথ্য সহজেই জানতে পারেন সে জন্য ওই তালিকা সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। যারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তাদের জন্য একটি আপৎকালীন ত্রাণ তহবিল গড়বে। রাজ্যের সামাজিক ন্যায় দপ্তরের অধীনে থাকা নির্ভয়া সেল ভালো কাজ করলেও যৌন নির্যাতনের শিকারদের জন্য কোনও আপৎকালীন ত্রাণ তহবিল ছিল না এত দিন কেরলে।

● **খারিজ ২৬ সপ্তাহে গর্ভপাতের আবেদন :**

ভ্রূণে দেখা গিয়েছিল ডাউন সিন্ড্রোমের লক্ষণ। এর জেরে শিশু জন্মালে সে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে ভেবে সুপ্রিম কোর্টে গর্ভপাতের আবেদন জানিয়েছিলেন এক ৩৭ বছরের মহিলা। গত পয়লা মার্চ সেই আবেদন খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বিচারপতি এস. এ. বোবদে ও বিচারপতি এল. নাগেশ্বর রাও-এর ডিভিশন বেঞ্চ জানান, ভ্রূণটির বয়স ২৬ সপ্তাহ। বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গর্ভাবস্থা চলাকালীন মায়ের জীবন সংশয় হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি বিচার করার পর এক্ষেত্রে গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, গর্ভপাত সংক্রান্ত (মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি বা এমটিপি) আইন অনুযায়ী, ভ্রূণের বয়স ১২ সপ্তাহ হওয়া পর্যন্ত গর্ভপাত করা যায়। ১২ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করাতে গেলে দুই চিকিৎসকের অনুমতি নিতে হয়। ২০ সপ্তাহের পরে গর্ভপাত নিষিদ্ধ।

● **গ্রামীণ ওড়িশায় বিপুল উত্থান বিজেপি-র :**

নোটবন্দির পর প্রথম গ্রামীণ নির্বাচনে বিস্ময়কর সাফল্য বিজেপি-র। ওড়িশার পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসকে বহু পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল দল। নবীন পট্টনায়কের দল কোনও ক্রমে প্রথম স্থানটি ধরে রেখেছে। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বছরের শাসনকালে বিজেডি এত বড়ো ধাক্কা কখনও খায়নি। ৩০-টি জেলা পরিষদের মোট ৮৫১-টি আসনে ভোট হয়েছে। ৮৫০-টির ফলই ঘোষিত। শাসক বিজেডি জয়ী হয়েছে ৪৫৯-টি আসনে। বিজেপি জিতেছে ৩০৭-টি। আর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে নেমে ৬৭-টি আসনে জয়ী হয়েছে। অন্যান্যরা জিতেছে ১৭-টি আসনে। পাঁচ বছর আগের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলকে এর পাশাপাশি রাখলে আরও স্পষ্ট হচ্ছে, কতখানি হাওয়া ঘুরেছে গেরুয়া শিবিরের দিকে। ২০১২-র নির্বাচনে বিজেডি পেয়েছিল ৬৫১-টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছিল ১২৮-টি। তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৩৬-টি আসন। অন্যরাও ৩৬-টি। ৩০-টি জেলা পরিষদ বোর্ডের মধ্যে গতবার একটিও ছিল না বিজেপি-র হাতে। ২৮-টি ছিল বিজেডি-র হাতে। ২-টি বোর্ড দখল করেছিল কংগ্রেস। এবার কংগ্রেসের দখলে ১-টি বোর্ড। বিজেডি ২৮ থেকে নেমে ১৬। আর বিজেপি ০ থেকে বেড়ে ৮।

● **ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর, কাজে গতি আনতে উদ্যোগী এনএইচএআই :**

শিলচর-সৌরাষ্ট্র 'ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর' নির্মাণে গতি আনতে উদ্যোগী হল ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)। এনএইচআই-এর প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট ইউনিট অফিস খোলা হচ্ছে

হাফলং শহরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ী অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে চিঠি দিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় হাইওয়ের কাজে নিযুক্ত নির্মাণ সংস্থা ও এনএইচএআই কর্তাদের সুরক্ষায় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন।

১৯৯৮ সালে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের শিলান্যাস হওয়ার পর ডিমা হাসাও জেলায় নিরাপত্তাজনিত কারণে থমকে যায় কাজ। সমস্যা ছিল জমি অধিগ্রহণ ও ভূতাত্ত্বিক জটিলতাও। বন ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র না পাওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে ডিমা হাসাও জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। অন্যান্য সমস্যাও অনেকটাই মিটেছে। তা সত্ত্বেও হাইওয়ে নির্মাণের কাজ না এগোনোয় কেন্দ্র চাপ তৈরি করে এনএইচএআই-এর উপর। ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের এএস-২৪, এএস-২৫ এবং এএস-২৬ প্যাকেজের কাজ শেষ করার সময়সীমা ছিল ২০১৩-'১৪ সাল। এর মধ্যে আবার এএস-২৫ প্যাকেজ, জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে কাজ বন্ধ রয়েছে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থাকে বাতিল করার কারণে। ওই অংশের কাজের জন্য নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হবে।

● **নাগাল্যান্ডে নতুন মুখ্যমন্ত্রী সুরহোজেলি :**

নাগাল্যান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর গদি ফিরে পেতে ব্যর্থ নেফিয়ুরিও। টি. আর. জেলিয়াং পদত্যাগ করার পর গত ২১ ফেব্রুয়ারি এনফিএফ ও ড্যান জোটের বিধায়করা এনপিএফ সভাপতি সুরহোজেলি লিজিৎসুকে রাজ্যের ১৭-তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাছেন। সুহরোজেলির প্রস্তাবে জেলিয়াংকে জোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

খ্রিস্টান-প্রধান নাগাল্যান্ডে গির্জাগুলি দুই আঙ্গামি নেতার লড়াইয়ে সুরহোজেলির পক্ষ নেয়। নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর সুরহোজেলি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবি নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপাল পি. বি. আচার্যের সঙ্গে দেখা করেন। শপথ গ্রহণ হয় ২২ ফেব্রুয়ারি। এবার ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচনে জিতে বিধায়ক হতে হবে সুরহোজেলিকে। দুই দফায় নগরোন্নয়নমন্ত্রী ও একবার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সুরহোজেলি ২০১৩ সালের ভোটে স্বেচ্ছায় না লড়ে ছেলে কে. লিজিৎসুকে নিজের আসনে দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি এখন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের পরিষদীয় সচিব।

● **অসম থেকে বহিষ্কার হাজার তিরিশেক অনুপ্রবেশকারী :**

অসম চুক্তির পর থেকে গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত ২৯ হাজার ৭১২ জন অনুপ্রবেশকারীকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অসম বিধানসভায় এই তথ্য জানান মন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনি আরও জানান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০৮.৬৫ কিলোমিটার কাঁটাতার বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। বেড়া বসানো বাকি ৭১.৪১ কিলোমিটারে। তার মধ্যে সাড়ে ছয় কিলোমিটার স্থলসীমান্ত। বাকিটা নদী, চর, সেতু বা কালভার্টের অন্তর্ভুক্ত। স্থলভাগের সাড়ে ছয় কিলোমিটারের মধ্যে সাড়ে তিন কিলোমিটার করিমগঞ্জ জেলায়। তা নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবি-র মধ্যে আলোচনা চলছে। বাকি তিন কিলোমিটার অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

নাগরিকপঞ্জি উন্নীতকরণের কাজ প্রসঙ্গে সরকারের তরফে বিধানসভায় জানানো হয়েছে, ৩০ হাজার ২২৯ জন সরকারি কর্মী নথি পরীক্ষার কাজ করছেন। ভুয়ো নথি জমা দেওয়ায় এখন পর্যন্ত ১৭৬-টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সন্দেহজনক নথি যাচাইয়ের কাজ দ্রুত করার জন্য বিশেষ তদন্ত দল গড়েছে পুলিশ। মোট ৬ কোটি ১৪ লক্ষ জমা পড়া নথির মধ্যে ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ নথি পরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। নাগরিকপঞ্জি নবীকরণের জন্য খরচ ৯০৮ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র দিয়েছে ৪৩৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে খরচ হয়েছে ৩৩৪.৫৭ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার খরচ করেছে ২১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। তা পরে কেন্দ্র ফেরত দেবে। ডি-ভোটার বিষয়ে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৪৮ জন সন্দেহভাজন ভোটার অসমে রয়েছেন। ভারতীয় বলে ঘোষিত হয়েছেন ৬২ হাজার ৩৮৫ জন ডি-ভোটার।

● **জাতীয় সড়কে মদের দোকান নিষিদ্ধ, বিজ্ঞপ্তি অসমে :**

জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ৫০০ মিটারের দূরত্বের মধ্যে সব মদের দোকান ও পানশালা বন্ধ বা স্থানান্তরিত করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করল অসমের আবগারি দপ্তর। দপ্তরের হিসেবে, রাজ্যে ১ হাজার ২৬৬-টি নথিভুক্ত মদের দোকান রয়েছে। তার মধ্যে ৫৯৮-টি দোকান জাতীয় বা রাজ্য সড়কের পাশে অবস্থিত। রাজ্যের ৭৬৯-টি নথিভুক্ত পানশালার মধ্যে জাতীয় বা রাজ্য সড়কের পাশে থাকা পানশালার সংখ্যা ৩৮০-টি।

রাজ্য সরকারের নির্দেশ, ৩১ মার্চের মধ্যে সে সব দোকান ও পানশালা স্থানান্তরিত করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা না করা হলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। পুলিশ ও প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, শুধুমাত্র গুয়াহাটি শহরে রাস্তার পাশে থাকা মদের দোকানের সংখ্যা ৬৩-টি। পানশালা ১৮-টি। তার মধ্যে বড় হোটেলের পানশালাও রয়েছে। দপ্তর জানিয়েছে, গত বছর ১৫ ডিসেম্বর সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মেনেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

'অ্যারাইভ সেফ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করে দাবি করেছিল, প্রতি বছর ভারতে এক লক্ষ ৪২ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তার বেশির ভাগের কারণ মত্ত হয়ে গাড়ি চালানো। তার জেরেই ওই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

● **মহারাষ্ট্র পুরভোটে গেরুয়া ঢেউ :**

মহারাষ্ট্রের ১০ পুরসভা এবং ২৫ জেলা পরিষদের ভোটে বাজিমাৎ করল বিজেপি। ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল বের হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি। গত প্রায় ২০ বছর ধরে বৃহৎ মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন শিবসেনার দখলে। সেনাকে সমর্থন করেছিল বিজেপি। কিন্তু এ বার বিজেপির সঙ্গে তাদের জোট হয়নি। দু'দল আলাদা আলাদা লড়লেও ফল প্রকাশের পর বিজেপির সমর্থনেই গত ৮ মার্চ বৃহৎ মুম্বাই পুরসভার মেয়র হলেন শিবসেনার বিশ্বনাথ মহাদেশ্বর। দেশের সব থেকে ধনী পুরসভায় ক্ষমতায় এলেও শিবসেনা এককভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি। ২২৭ আসনের মধ্যে ৮৪-টি পেয়েছে শিবসেনা, ৮২-টি বিজেপি। ৩১-টি আসন নিয়ে তিন নম্বরে কংগ্রেস। রাজ্যের বাকি আটটি পুরসভা—পুনে, নাগপুর, আকোলা, পিম্পড়ি-চিঞ্চওয়াড়, অমরাবতী, নাসিক, উল্লাসনগর, সোলাপুর দখল করেছে

বিজেপি। ঠাণে রইল সেনার দখলে। মহারাষ্ট্রের এই মিনি বিধানসভা নির্বাচনে মূল লড়াইটা ছিল শিবসেনা বনাম বিজেপি। আর বিজেপি, সেনার লড়াইয়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে কংগ্রেস। বৃহৎ মুম্বাই পুরসভায় গত বারের চেয়ে গোটা ২০ আসন কম পেয়েছে তারা। বাকি পুরসভাগুলিতেও দূরবীণ দিয়ে খুঁজতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। ২৫-টি জেলাপরিষদ ও ১১৮-টি পঞ্চায়েত সমিতিতেও শক্তি পরীক্ষা হয়েছে। জেলা পরিষদের মোট ১৫১৪-টি আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে গেছে ৩৭০-টি আসন, এনসিপি পেয়েছে ৩১৭-টি, কংগ্রেস ২৭৭, শিবসেনা ২৪০ এবং অন্যান্যরা পেয়েছে ১২৭-টি আসন।

● **ফরমালিন বিতর্ক, ত্রিপুরায় বন্ধ বাংলাদেশি মাছ আমদানি :**

ফরমালিন মাখানো মাছের বাংলাদেশি চালান অলিখিত ভাবে বন্ধ করে দিল ত্রিপুরা সরকার ও আগরতলার স্থল কাস্টমস। সম্প্রতি আগরতলার মাছের বাজারগুলিতে বাইরে থেকে আসা, বিশেষ করে তেলেঙ্গনা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বাংলাদেশের চালানি মাছের মধ্যে ফরমালিনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। মৎস্য ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, চালানি মাছ দু-তিন সপ্তাহ ঠিকঠাক রাখার জন্য নিরাপদ মাত্রায় ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর বিষয়টি জানার পরেই ফরমালিন-যুক্ত মাছ বন্ধের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বিধানসভায় এই মর্মে একটি বিবৃতিও দেন। পাশাপাশি, বাজার থেকে সংগ্রহ করা নমুনা রাজ্যের আঞ্চলিক খাদ্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করানোর রিপোর্টও বিধানসভায় পেশ করেন। উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞদের অভিমত ফরমালিন মানুষের দেহে একদিকে যেমন ক্যান্সারের কারণ হতে পারে, তেমনই কিডনিরও ক্ষতি করতে পারে।

সরকারি এই রিপোর্ট ও বিধানসভায় মন্ত্রীর বক্তব্যে উদ্বিগ্ন কাস্টমস কর্তারা জানিয়ে দিয়েছেন, আগরতলা-আখাউড়া সীমান্তের স্থল বন্দর দিয়ে আর বাংলাদেশি মাছ ঢুকতে দেওয়া হবে না। ভারতে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থল বন্দর দিয়েই দু'দেশের মাছ আমদানি-রপ্তানির অনুমোদন আছে। ত্রিপুরার কোনও স্থলবন্দর দিয়েই মাছ আমদানি করার অনুমতি নেই। এতদিন শুধু মাত্র ত্রিপুরার মানুষের কথা ভেবেই এই মাছ আমদানি করতে দেওয়া হ'ত।

● **হাইকোর্টের বেঞ্চ নিয়ে সংসদে বিল :**

শিলচরে গৌহাটি হাইকোর্টের পৃথক বেঞ্চ স্থাপনের জন্য লোকসভায় বেসরকারি বিল এনেছেন কংগ্রেস সাংসদ সুস্মিতা দেব। গত ১১ মার্চ বিলটি উপস্থাপন করে তিনি বলেন—অসম ছাড়া মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলপ্রদেশ গৌহাটি হাইকোর্টের আওতাভুক্ত। সব মিলিয়ে যত মামলা রয়েছে, তার ৪০-৪৫ শতাংশ মামলা বরাক উপত্যকার। শিলচর শুধু কাছাড়ের জেলাসদর নয়, বরাকের গুরুত্বপূর্ণ শহর। সেখানে পৃথক বেঞ্চ স্থাপন হলে ডিমা হাসাও জেলার মানুষও সুবিধা পাবেন।

শিলচরে হাইকোর্টের পৃথক বেঞ্চ স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে শিলচর বার অ্যাসোসিয়েশন এ নিয়ে আন্দোলনও করে। কিন্তু হাইকোর্ট ওই দাবির যৌক্তিকতা খারিজ করে দেয়। গত বছর ২৫ জুলাই বিলটি লোকসভা সচিবালয়ে জমা করেছিলেন সুস্মিতাদেবী। ৮ মাস পর সেটি উপস্থাপনের সুযোগ মিলল। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে তৎকালীন বিজেপি সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ শিলচরে পৃথক বেঞ্চের দাবিতে সরব হয়েছিলেন। তখন ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মণিপুরে হাইকোর্ট স্থাপনের বিল পেশ হয়েছিল সংসদে।

● **বিজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীর নাম-ছবি, ক্ষমা চাইল জিও, পেটিএম :**

ক্ষমা চাইল রিলায়্যান্স জিও এবং পেটিএম। অনুমতি না নিয়েই এই দুই সংস্থা তাদের বিজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীর নাম এবং ছবি ব্যবহার করেছিল। সে কারণে ফেব্রুয়ারিতে ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রক তাদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করে। সেই নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতেই গত ১০ মার্চ ক্ষমা চায় এই দুই সংস্থা। তাদের বিজ্ঞাপন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নাম এবং ছবি।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে রিলায়্যান্স জিও তাদের একটি ৪-জি সার্ভিসের বিজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার প্রসঙ্গে টেনে আনে। 'রিলায়্যান্স জিও : ডিজিটাল লাইফ' শিরোনামে ওই বিজ্ঞাপনে নরেন্দ্র মোদীর ছবি এবং নাম ব্যবহার করা হয়। এর জন্য মৌখিক কথাবার্তা হলেও কোনও লিখিত অনুমতি নেয়নি রিলায়্যান্স। পেটিএম-এর ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ ওঠে। ২০১৬ সালে ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের ঘোষণার পর সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে একটি বিজ্ঞাপন করে পেটিএম। সেই বিজ্ঞাপনেও অনুমতি ছাড়াই নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেখানো হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ

- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান দাখিল করে কেন্দ্রের দাবি, গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচারের সংখ্যা সর্বাধিক। রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কৃষ্ণা রাজ সম্প্রতি জানিয়েছেন, ২০১৫-'১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু পাচারে পয়লা নম্বরে ছিল। ২০১৫ সালে নারী পাচার হয়েছে ২০৬৪। পরের বছর ৩৫৫৯। শিশু পাচার ২০১৫ সালে ছিল ১৭৯২; ২০১৬-তে ৩১১৩।
- রাজ্যের মহিলা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত তিন বছরে কর্মক্ষেত্রে হয়রানির যেসব অভিযোগ জমা পড়েছে তার বেশির ভাগটাই স্কুল-কলেজ থেকে। কমিশন থেকে সব ক'টি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে সুপারিশ পাঠালেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানা হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে মহিলা কমিশনের কাছে ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে কর্মক্ষেত্রে যৌন-হেনস্থার অভিযোগ জমা পড়েছিল ২৫ এবং ৩১-টি। তার মধ্যে দু' বছরেই স্কুল থেকে জমা পড়া অভিযোগের সংখ্যা ১২-টি। ২০১৬ সালে ২০-টি অভিযোগের মধ্যে ৯-টি অভিযোগই আসে স্কুল থেকে।
- পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে আবার চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের নাম ইংরেজিতে 'বেঙ্গল' আর বাংলায় 'বাংলা' রাখার সিদ্ধান্ত গত বছর বিধানসভায় অনুমোদিত হয়। তার পরে চিঠি

লিখে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্র এখনও কোনও জবাব না দেওয়ায় মার্চে এই দ্বিতীয় চিঠি রাজ্য সরকারের।

● **রাজ্য বিধানসভায় পাস স্বাস্থ্য বিল :**

বিধানসভায় পাস হয়ে গেল ক্লিনিক্যাল এসটাবলিশমেন্ট বিল। বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসায় গাফিলতি, অনিয়ম এবং আর্থিক জুলুম রুখতে এই বিল আনে রাজ্য সরকার। গত ৩ মার্চ বিলটি পেশ হওয়ার পর সরকারি হাসপাতালগুলিকে এই বিলের আওতায় আনা হয়নি বলে বিরোধী দলগুলি এর সমালোচনায় সরব হয়। এরই মধ্যে সরকার ধ্বনি ভোটে পাস করিয়ে নেয় বিলটি। বিরোধীরা বিলকে সমর্থন জানাননি। তবে প্রস্তাবের বিপক্ষেও তারা ভোট দেননি। খসড়া থেকে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু বা ক্ষতির অভিযোগ প্রমাণ হলেই হাসপাতালকে মোটা অংকের জরিমানা করার পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার। খুব গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রেও আর্থিক কারণে চিকিৎসা না করা, রোগীর পরিবার টাকা মেটাতে না পারায় মৃতদেহ আটকে রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ করানোর যে ভুরি ভুরি অভিযোগ বেসরকারি হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে ওঠে, তা রুখতে কঠোর ফৌজদারি পদক্ষেপের ব্যবস্থাও বিলে থাকছে।

১. চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগীর মৃত্যু হলে ন্যূনতম জরিমানা হবে ১০ লক্ষ টাকা।
২. চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগীর সামান্য ক্ষতি হলে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
৩. একই কারণে রোগী বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হলে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
৪. দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ধর্ষণ ও অ্যাসিড হামলার মতো ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থান না দেখে চিকিৎসা করতে হবে।
৫. মৃতের পরিবারের কাছে টাকা না থাকলে দেহ আটকে রাখা যাবে না।
৬. টাকার অভাবে জীবনদায়ী ওষুধ কিংবা চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না।
৭. অপ্রয়োজনীয় টেস্ট করিয়ে খরচ বাড়ানো যাবে না।
৮. প্যাকেজ-ভুক্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমে এক রকম খরচের কথা বলে পরে বাড়তি খরচ চাপানো যাবে না।
৯. বিধি অমান্য করলে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন।

সরকারি হাসপাতাল কিন্তু এই বিলের আওতায় আসছে না। প্রসঙ্গত, চিকিৎসার বাড়তি খরচ, রোগী হেনস্থা ও হাসাপাতালে ভাঙচুর আটকাতে ২০১০ সালের ২৯ জুলাই 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) বিল' পাস করিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারও। পুরোনো আইনের সঙ্গে নতুন বিলের গুণগত ফারাক বিশেষ নেই। সাত বছর আগে সিলেক্ট কমিটিতে 'ডিসেন্ট নোট' দিয়ে ওই বিলের বিরোধিতা করেছিল তৃণমূলই। তাদের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় আইন না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের ১৯৫০ সালের আইনেই কাজ চলুক। এখন কিন্তু মমতা কার্যত পুরোনো বিলটির পথেই হাঁটলেন। বিলের নামে 'ট্রান্সপারেন্সি' (স্বচ্ছতা) শব্দটি যোগ হয়েছে।

● **মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন-ভাতা বাড়াল রাজ্য :**

মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন এবং ভাতা বাড়ল এ রাজ্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় দ্বিতীয়বার। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য বিধায়ক-মন্ত্রীদের বেতন তুলনায় নেহাতই কম। এই পরম্পরা চালু দীর্ঘ দিন। এখন উত্তরপ্রদেশে বিধায়কেরা পান মাসে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। দিল্লির বিধায়কেরা পান ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে। সেই সঙ্গে বছরে ভ্রমণ ভাতা বাবদ ৩ লক্ষ টাকা। তেলঙ্গানায় বিধায়কদের বেতন মাসে আড়াই লক্ষ টাকা করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সেখানে বর্ধিত বেতন ধরে বাংলার বিধায়কেরা পাবেন ২১ হাজার ৮৭০ টাকা করে। অফিসে হাজিরা দিলে বা স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকলে তাদের প্রাপ্য দৈনিক এক হাজার টাকা ভাতা অপরিবর্তিতই থাকছে। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ওই ভাতা বেড়ে হচ্ছে দু' হাজার। সব মিলিয়ে মন্ত্রীরা মাস গেলে পাবেন ৮১ হাজার ৩০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী পাবেন ৮৬ হাজার ৩০০ টাকা।

বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বার্স ইমোলিউমেন্টস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৭' এবং 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাওন্সেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৭'—এই জোড়া বিল পাস হয়েছে গত ১০ মার্চ।

● **পথ নিরাপত্তায় রাস্তায় ওয়াচ টাওয়ার :**

পথ নিরাপত্তায় 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' স্লোগান-সহ জোরদার প্রচারের পর এবার 'ওয়াচ টাওয়ার' বসানোর সিদ্ধান্ত। বেপরোয়া যানবাহনের উপর নজরদারি চালাতে রাজ্য জুড়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ এবং দুর্গম এমন একশোটি রাস্তাতে আপাতত একশো ওয়াচ টাওয়ার বসাবে পুলিশ। পরিকাঠামো সরবরাহ করবে পরিবহণ দপ্তর।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, টাওয়ারের উচ্চতা হবে ২০ ফুট। সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সব গাড়ির গতিবিধি ক্যামেরা-বন্দি করা হবে এবং সর্বক্ষণ অন্তত একজন সশস্ত্র পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন। বেপরোয়া গাড়ি দেখলে ওয়াকিটকি থেকে কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠানো হবে। পরিবহণ-কর্তাদের সঙ্গে গত মাসে এক বৈঠকে এই প্রস্তাব দেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা। বিষয়টি চূড়ান্ত করে ঠিক হয়, অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ ৪৩-টি এলাকা চিহ্নিত করে বসানো হবে ওয়াচ টাওয়ার। বাকি ৫৭-টি ওয়াচ টাওয়ার বসবে জঙ্গলমহল, জঙ্গল এবং পাহাড়ের বিপজ্জনক এলাকায়। প্রতিটি ওয়াচ টাওয়ার তৈরিতে অন্তত আট লক্ষ টাকা খরচ হবে। রাজ্য পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের দায়িত্বে থাকবে সব ওয়াচ টাওয়ার।

● **মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা নিযুক্ত অনিল বর্মা :**

খাদ্য দপ্তরের সচিব অনিল বর্মাকে সম্প্রতি স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিষয়ক দপ্তরের সচিব পদে বদলি করে রাজ্য সরকার। খাদ্য দপ্তরে তার কাজের শেষ দিন ছিল গত ৮ মার্চ। ৯ মার্চ এই আইএএস অফিসারকে নবান্নে ডেকে পাঠিয়ে 'মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা' নিযুক্ত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেই বসবেন তিনি। সঙ্গে অবশ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিষয়ক দপ্তরের

সচিবও থাকছেন। অনিল বর্মাকে নিজের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করার ফাইল ৯ মার্চ-ই সই করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সিএমও-তে এরকম কোনও পদ না থাকায় তা তৈরির জন্য মন্ত্রীসভার অনুমোদন নিতে হবে। প্রথমে তাকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিগমের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিংবা কৃষি বিপণন দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিতে চেয়েও শেষপর্যন্ত মত বদলে 'খাদ্যসাথী' এবং ডিজিট্যাল রেশন কার্ড প্রকল্প চালুর অন্যতম হোতা প্রাক্তন এই খাদ্যসচিবের জন্য নতুন পদ তৈরি করেন মুখ্যমন্ত্রী। খাদ্য সুরক্ষার কাজে খাদ্য দপ্তর ছাড়াও অন্যান্য কিছু দপ্তর যুক্ত। সব দপ্তরের সুষ্ঠু সমন্বয় করে পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করবেন তিনি।

● **কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি :**

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চিন্নাস্বামী স্বামীনাথন কারনানের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করল শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জগদীশ সিংহ খেহরের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ-এর নির্দেশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি-কে সেই পরোয়ানা কার্যকর করে ৩১ মার্চের মধ্যে বিচারপতি কারনানকে সুপ্রিম কোর্টে হাজির করাতে হবে। তবে বিচারপতি কারনানের বিরুদ্ধে জারি করা পরোয়ানা জামিনযোগ্য।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্টে নিজের বদলির আদেশ স্থগিত করে শিরোনামে এসেছিলেন বিচারপতি কারনান। বিচার বিভাগে দুর্নীতি নিয়ে চিঠির প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বিচারপতি কারনানকে আদালতে তলব করে। জবাবে বিচার বিভাগে জাতপাতের বিদ্বেষের অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টকে বিস্ফোরক চিঠি লেখেন কারনান। প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে শীর্ষ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে লেখা চিঠিতে বিচারপতি কারনানের আর্জি ছিল, বর্তমান প্রধান বিচারপতির অবসরের পর যেন তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার বিচার করা হয়। সেই মামলাতেই গত ৮ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি কারনানকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের বিচার এবং প্রশাসনিক কাজ থেকে সরিয়ে তার জিম্মায় থাকা বিচার ও প্রশাসনিক বিষয়ের সব ফাইল কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ দেয়। ৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি পর পর দু'বার শীর্ষ আদালতে হাজিরার নির্দেশ অমান্য করায় গত ১০ মার্চ তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করা হয়। এদিকে পরোয়ানা জারির পর ওই দিনই দুপুরে নিউ টাউনে নিজের বাড়িতে আদালত বসিয়ে সেই ৭ বিচারপতির বিরুদ্ধেই পাল্টা সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি কারনান। শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে বিচারপতি কারনানের দাবি, হাইকোর্টে কর্মরত কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পারে না। কোন উদ্দেশ্যে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল, তপশিলি জাতি-উপজাতি নিপীড়ন-বিরোধী আইনে সিবিআই তা তদন্ত করে দেখুক। দেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ নজিরবিহীন। একই সঙ্গে, শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি পাল্টা সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন—এ ঘটনাও অভূতপূর্ব।

● **স্পিড গভর্নর বসানো নিয়ে টানা-পোড়েন রাজ্য প্রশাসনে :**

গাড়ির বেপরোয়া গতিকে নির্দিষ্ট সীমায় বাঁধতে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এক বছরের বেশি আগে। কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন যন্ত্রের, নাম স্পিড গভর্নর। কোন সংস্থার স্পিড গভর্নর বসানো হবে, তা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের মধ্যে টানা-পোড়েনে এতদিনেও যন্ত্র বসানো যাচ্ছে না। এক পক্ষের বক্তব্য ভালো মানের স্পিড গভর্নরগুলির একটা তালিকা করতে হবে। অন্য পক্ষের মত, বাণিজ্যিক বা বেসরকারি গাড়িতে কোন সংস্থার স্পিড গভর্নর বসবে, সেটা সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। বাজারে বহু সংস্থা স্পিড গভর্নর বানায়। গাড়ির গতিবেগ নির্দিষ্ট মাত্রার উপরে না গেলেই হল।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালে মোটর ভেহিকেলস আইন সংশোধন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সে বছরই সুপ্রিম কোর্ট সব রাজ্যকে দ্রুত এই নিয়ম চালুর নির্দেশ দেয়। ২০১৬-র জানুয়ারিতে জারি হওয়া রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বেসরকারি ও সরকারি বাস-মিনিবাস, ট্যাক্সি, ছোটো বাস, লাক্সারি ট্যাক্সি বা ম্যাক্সি ক্যাবের মতো গাড়িগুলি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারবে। আর ডাম্পার, ট্যাঙ্কার, স্কুল বাস বা বিপজ্জনক সামগ্রী-সহ পণ্যবাহী ট্রাক ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে চলতে পারবে না। লাগামের বাইরে অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের মতো জরুরি পরিষেবা ও পুলিশের গাড়ি।

● **রাজ্যে আরও তিন পুলিশ-জেলা :**

ঝাড়গ্রামের পরে আরও তিন পুলিশ-জেলা রাজ্যে। সব ক'টিই দক্ষিণ ২৪ পরগণায়। কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার ও বারুইপুর। গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ওই তিন পুলিশ-জেলার অনুমোদন মেলে। কাকদ্বীপ পুলিশ-জেলা গড়া হয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমার ন'টি থানা-সহ ১৩-টি থানা নিয়ে। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ-জেলায় ওই মহকুমার সব থানা ছাড়াও আছে কলকাতার লাগোয়া আলিপুর মহকুমার থানাগুলি। আর বারুইপুর মহকুমার সব থানা নিয়ে গঠিত বারুইপুর পুলিশ-জেলা। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে বাম আমলে ঝাড়গ্রামকে এ রাজ্যে প্রথম পুলিশ-জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। সেখানে পুলিশ সুপারই সর্বোচ্চ পদ। নতুন পুলিশ-জেলায় সুপারের উপরে এক জন সিনিয়র সুপার রাখার প্রস্তাব রয়েছে। আপাতত বারুইপুর জেলা পরিষদ ভবনে অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু করেছেন বারুইপুর জেলার পুলিশ সুপার। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ সুপার সেচ দপ্তরের বাংলোয় বসে কাজ করছেন। কুলপিতে 'পথের-সাথী' নামে একটি হোটেলে সুন্দরবন পুলিশ সুপারের অস্থায়ী অফিস তৈরি হয়েছে। আলিপুর সদর দপ্তরে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর (ডিআইবি) সদর অফিস ছিল। ওই অফিসের কর্মীদেরও তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে।

● **অ্যাসিডে দগ্ধদের বাড়তি সাহায্য রাজ্যের :**

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত সম্প্রতি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অ্যাসিড-হানায় আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসার খরচ, পুনর্বাসন ও প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের পরিকল্পনা কী, ১০ মার্চ আদালতে তা জানাতে হবে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত আদালতে জানান, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ রাজ্যে ১৪ বছর বা তার কম বয়সের অ্যাসিড-আক্রান্তদের ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ তিন লক্ষ টাকার উপরে ৫০ শতাংশ বেশি দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার ইতোমধ্যেই এই ধরনের পীড়িতদের জন্য ২০০ কোটি টাকার তহবিল গড়েছে। ওই খাতে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সাড়ে ১২ কোটি টাকা। অ্যাসিড আক্রান্তদের চিকিৎসা খরচের পুরোটাই সরকারি হাসপাতাল বহন করবে বলে রাজ্যের তরফে আদালতে জানান এজি। বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আক্রান্তেরা চিকিৎসার জন্য গেলে টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। চিকিৎসার জন্য বাড়তি টাকার প্রয়োজন হলে রাজ্য বা জেলার লিগাল এড সার্ভিসেস বিষয়টি দেখবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৭ এপ্রিল।

● **রাজ্য প্রশাসনে বড়ো রদবদল :**

গত ৬ মার্চ রাজ্য প্রশাসনে বেশ কিছু রদবদল হল। আলোচনার কেন্দ্রে খাদ্যসচিব অনিল বর্মার নাম। তাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী দপ্তরের সচিব পদে বদলি করা হয়। গত পাঁচ বছর খাদ্যসচিব ছিলেন অনিল বর্মা। নতুন খাদ্যসচিব হয়েছেন মনোজ অগ্রবাল। উল্লেখ্য, মনোজ অগ্রবালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই। অগ্রবালের কর্মীবর্গ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রভাত মিশ্রকে। তিনি ছিলেন মৎস্যসচিব। সেখানে এলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী দপ্তরের সচিব সুনীল গুপ্ত।

কয়েক জন জেলাশাসককেও বদলি করা হয়েছে। বর্ধমান ও দক্ষিণ ২৪-পরগণার জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন এবং পি. ভি. সালিমকে যথাক্রমে স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের সচিব করা হয়েছে. ওই দুই জেলার দায়িত্ব পেলেন ওয়াই রত্নাকর রাও ও অনুরাগ শ্রীবাস্তব। রাও মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ছিলেন। সেখানে যাচ্ছেন মালদহের জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী। মালদহের জেলাশাসক হলেন তন্ময় চক্রবর্তী। তার জায়গায় পুরুলিয়া জেলাশাসক হলেন অলোকেশ প্রসাদ রায়। অনুরাগ শ্রীবাস্তব ছিলেন দার্জিলিঙের জেলাশাসক। সেখানে এলেন দক্ষিণ ২৪-পরগণার অতিরিক্ত জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্ত। আলোকেশ প্রসাদ রায় বিধাননগর পুরসভার কমিশনার ছিলেন। ওই দায়িত্ব পেলেন পৃথা সরকার।

● **রাজ্যে পুরুষের জেলে প্রথম মহিলা সুপার :**

এই প্রথম রাজ্যের একটি পুরুষ জেলের সুপার পদে নিযুক্ত হলেন এক মহিলা। শকুন্তলা সেন। গত পয়লা মার্চ বাঁকুড়া জেলার পুরুষ জেলের স্থায়ী সুপার নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, জানুয়ারিতে 'হাই সিকিওরিটি' তিহাড় পুরুষ জেলের প্রথম মহিলা সুপার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অঞ্জু মঙ্গলা। তিহাড়ে ডিজি-র পদে এর আগে বসেছেন কিরণ বেদী, বিমলা মেহরার মতো দুঁদে মহিলা অফিসার। তবে সেখানকার পুরুষ জেলে প্রথম মহিলা সুপার অঞ্জুই। এ রাজ্যেও এর আগে মহিলা জেলের সুপার হয়েছেন মহিলারা। তবে পুরুষ জেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন জেলে মাত্র ২৫৩ জন মহিলা অফিসার রয়েছেন। তাদের মধ্যে এ রাজ্যে আছেন মাত্র ১২ জন। শকুন্তলাদেবী এর আগে দমদম ও বহরমপুর পুরুষ জেলের জেলার এবং প্রেসিডেন্সি জেলের সহকারী জেলারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

● **অতিরিক্ত ওষুধ চিংড়িতে, চাপে রপ্তানিকারীরা :**

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে চাষ হওয়া ভ্যানামেই চিংড়ি আমদানি বন্ধ করার হুমকি দিয়েছে ইউরোপের নানা দেশ, আমেরিকা ও ভিয়েতনাম। তাদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা চিংড়িতে মাত্রাতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ধরা পড়েছে। রপ্তানিকারক সংস্থাগুলিকে ওই সব দেশ জানিয়েছে, ফের অ্যান্টিবায়োটিক ধরা পড়লে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চিংড়ি আমদানির সমস্ত বরাত বাতিল করে দেওয়া হবে। কারণ, অন্য দেশ থেকে ওই সব দেশে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির প্রথম ও প্রধান শর্ত, মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা।

উল্লেখ, গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর ভ্যানামেই চিংড়ির চাষ হচ্ছে দক্ষিণ ২৪-পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুরে। এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদেশের বাজারে বছরে প্রায় ৫০ হাজার টন ভ্যানামেই চিংড়ি রপ্তানি হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা। রপ্তানির বরাত বাতিল হলে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়বেন রাজ্যের মৎস্য চাষি ও ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি কেন্দ্রের 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'-এর এক প্রতিনিধি দল সমীক্ষা চালিয়ে দেখে, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য চাষিদের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।

● **মানবাধিকারের স্বেচ্ছাসেবী এবার সব থানায় :**

রাজ্যের প্রতিটি থানা এলাকায় দশজন করে 'মানবাধিকার স্বেচ্ছাসেবক' নেবে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন। কোনও রকম পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক না নিয়ে কাজ করা ওই স্বেচ্ছাসেবীরা প্রত্যন্ত তল্লাটে কমিশনের তরফে নজর রাখবে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি কমিশন সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়। সংবাদ মাধ্যমকে একথা জানান কমিশনের চেয়ারম্যান, কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গিরীশচন্দ্র গুপ্ত। রাজ্যে মোট থানার সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশো। কাজেই মানবাধিকার স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে পাঁচ হাজার। এক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগতযোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রাজনৈতিক দলের সদস্য, নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য, অপরাধের অতীত আছে, ফৌজদারি মামলা ঝুলছে এমন কাউকে নেওয়া হবে না। বয়স ৩০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। তাদের কাছে অন্তত একটি চালু মোবাইল ফোন থাকতে হবে। আপাতত এক বছরের জন্য এদের নেওয়া হচ্ছে। তবে কমিশন যে কোনও সময়ে কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই এদের দায়িত্ব থেকে সরাতে পারে। কমিশন প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীকে

পরিচয়পত্র দেবে। পয়লা মার্চ থেকে কমিশনের ওয়েবসাইটে অনলাইনে বা ডাকে আবেদন করা যাবে। স্বেচ্ছাসেবীরা নিজের নিজের এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার উপর নজর রাখবেন ও তেমন কিছু ঘটলে কমিশনকে অবহিত করবেন।

অর্থনীতি

- জার্মান বহুজাতিক ফোক্সভাগেন গোষ্ঠী ও তাদের অন্যতম সংস্থা স্কোডা অটোর সঙ্গে হাত মেলাল টাটা মোটরস। লক্ষ্য, প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো ভাগ করে নেওয়া। এই জোটের ভিত্তিতে ২০১৯ সালে নতুন ধরনের গাড়ি বাজারে আনতে চায় টাটা। উন্নয়নশীল দেশে ছোটো গাড়ির বাজার ধরতে এর আগে জাপানের সুজুকির সঙ্গেও হাত মেলাতে উদ্যোগী হয়েছিল ফোক্সভাগেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা ভেস্তে যায়। গত ১০ মার্চ টাটা মোটরস, ফোক্সভাগেন ও স্কোডার শীর্ষ কর্তারা প্রাথমিক চুক্তি সই করেন।
- পাবলিক কল অফিস বা পিসিও-র ধাঁচে ওয়াই-ফাই পরিষেবা চালুর প্রস্তাব দিল টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ট্রাই। ট্রাইয়ের সুপারিশ, ছোটো ব্যবসায়ী বা দোকানিদের ওয়াই-ফাই হটস্পট চালু করার অনুমতি দিলে কম খরচে এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। এগুলি পাবলিক ডেটা অফিস বা পিডিও হিসেবে কাজ করবে। বড়ো সংস্থার পক্ষে এ ধরনের পরিষেবা লাভজনক নয়। ট্রাইয়ের প্রস্তাব, ইন্টারনেট পরিষেবা সংস্থার কাছ থেকে ব্যান্ড উইড্থ কিনে বিক্রি করা হবে পিডিও থেকে। ২ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত ডেটা সেখান থেকে কিনতে পারবেন মানুষ।
- ডিজিট্যাল লেনদেন সংস্থা পেটিএম-এর প্রায় ১ শতাংশ শেয়ার কিনতে অনিল অম্বানীর রিলায়্যান্স ক্যাপিটাল এক সময়ে টাকা ঢেলেছিল। এবার সেই শেয়ারই চিনেরই কমার্স সংস্থা আলিবাবাকে বেচে আর্থিক পরিষেবা সংস্থাটি ঘরে তুলল ২৭৫ কোটি। উল্লেখ্য, আলিবাবা ভারতের এই মোবাইল ওয়ালেটটির মূল সংস্থা ওয়ান-৯৭ কমিউনিকেশন্সের সব থেকে বড়ো অংশীদার। তবে রিলায়্যান্স ক্যাপ, পেটিএম ও ই-কমার্সের শেয়ার নিজেদের হাতেই রেখেছে। ওই নেট বাজারের অংশীদারিত্ব তারা ওয়ান-৯৭ কমিউনিকেশন্সে লগ্নি করার সুবাদে বিনা মূল্যে পেয়েছিল। প্রসঙ্গত, ওয়ান-৯৭ কমিউনিকেশন্সের তিনটি ব্যবসা— পেটিএম, ই-কমার্স ও পেটিএম পেমেন্টস ব্যাংক (পেমেন্টস ব্যাংক ও মোবাইল ওয়ালেট পরিষেবা) ও পেটিএম মোবাইল সলিউসন্স।
- ভারত স্টেজ-৬ (বিএস-৬) দূষণ বিধি সহায়ক গাড়ি আগামী বছরই ভারতের বাজারে আনতে তৈরি জার্মান বহুজাতিক মার্সিডিজ বেঞ্জ। তবে তেল সংস্থাগুলিকে ওই বিধি মেনে তেল জোগাতে হবে। গত ৮ মার্চ কলকাতায় পূর্বাঞ্চলের বাজারে মার্সিডিজের নতুন ই-ক্লাস গাড়ির অভিষেক অনুষ্ঠানে একথা জানান সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট (বিক্রি ও বিপণন) মাইকেল জব। এমনিতে বিএস-৬ চালুর কথা ২০২০ সালে। তার আগে সংস্থাগুলিকে গাড়ির ইঞ্জিন-সহ কিছু যন্ত্রাংশ উন্নত করতে হবে। এদিকে বিএস-৪ বিধি চালুর সময়সীমা পয়লা এপ্রিল। কিন্তু গাড়ি শিল্প মহলের অভিযোগ, দেশের সর্বত্র বিএস-৪ মাপকাঠির তেল না মেলায় ওই বিধি চালু করতে সমস্যা হচ্ছে।
- জিএসটি চালুর প্রক্রিয়া আরও এগোনোয় গত ৬ মার্চ ফের ২৯ হাজারের ঘরে ঢুকল সেনসেক্স। ২১৫.৭৪ পয়েন্ট উঠে তা দাঁড়ায় ২৯,০৪৮.১৯ অংক। যা গত দু' বছরে সর্বোচ্চ। নিফ্টি ৬৫.৯০ পয়েন্ট উঠে থিতু হয় ৮,৯৬৩.৪৫ অংকে।
- উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি পাট চাষে দক্ষতা বাড়াতে বছর দু'য়েক আগে হাতে নেওয়া প্রকল্প 'জুট আই কেয়ার' চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বস্ত্রমন্ত্রক। ২০১৫ সালে চালুর পরে সমন্বয়ের অভাবে তেমন সাফল্যের মুখ না দেখলেও এবার নতুন করে এর কাজ শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্বের রাজ্যগুলিতে। এই প্রকল্পে জাতীয় পাট পর্ষদ ও ভারতীয় পাট নিগম যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৫৫ হাজার চাষিকে প্রশিক্ষণের সঙ্গে দেবে প্রযুক্তিগত পরামর্শ। জোগানো হবে ৫০ শতাংশ ভরতুকিতে উন্নত মানের পরীক্ষিত বীজ। পরিকল্পনা পাট পচানোর সময় এখনকার ২০-২২ দিন থেকে অন্তত ১০-১২ দিনে নামানোরও। বস্ত্রমন্ত্রকের লক্ষ্য, পাটের মানোন্নয়ন। তাই কৃষিমন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ বৈঠকে প্রকল্প বহাল রাখার সিদ্ধান্ত।

- **পুরোনো নোট কেন জমা নয়, জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের :** প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও রিজার্ভ ব্যাংক পুরোনো নোট জমা না নেওয়ায় কেন্দ্র এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই)-এর কাছে কৈফিয়ত চাইল দেশের শীর্ষ আদালত। গত ৬ মার্চ প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহর এবং বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি এস. কে. কল-কে নিয়ে গড়া ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকার ও আরবিআই-এর কাছে এই নোটিস পাঠিয়েছে। নোটিসে কেন্দ্র এবং আরবিআই-কে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, ঘোষিত সময়সীমা অতিক্রম না হওয়া সত্ত্বেও কেন রিজার্ভ ব্যাংকে পুরোনো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট জমা নেওয়া হচ্ছে না? জনৈক সুধা মিশ্রের আবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ।

নোট বাতিলের সময় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ২০১৬-র ৩০ ডিসেম্বরের পর কোনও ব্যাংকে আর পুরোনো নোট জমা দেওয়া যাবে না। তবে আরবিআই-এর বিভিন্ন অফিসে তা জমা করা যাবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। রিজার্ভ ব্যাংকও বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, মুম্বই, কলকাতা, নয়াদিল্লি, চেন্নাই ও নাগপুরে নোট বদলানো যাবে। কেউ ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাংক, ডাকঘর ও আরবিআই-এর দপ্তরে তা না-করে থাকলেও এই সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী প্রশ্ন তুলেছেন, কেন অর্ডিন্যান্স জারি করে সকলের জন্য এই সুযোগ বন্ধ করা হল। উল্লেখ্য, অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, যারা নোট বাতিলের পরের পঞ্চাশ দিনে দেশের বাইরে ছিলেন, যে-সব সেনাকর্মী প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্তব্যরত ছিলেন কিংবা কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণে যারা আগে নোট জমা বা বদল করতে পারেননি, শুধু তারাই ৩১ মার্চ অবধি আরবিআই-এ সেই সুযোগ নিতে পারবেন। ডিভিশন বেঞ্চের মতে এটা রিজার্ভ

ব্যাংক ও কেন্দ্রের তরফে কথার খেলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

● **বিত্তশালী শহরের তালিকায় মুম্বাই ২১ নম্বরে :**

দেশের সব থেকে বেশি বড়ো লোকের বাস মুম্বইতে। শুধু দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, চেন্নাই-সমেত ভারতের অন্য সব শহরের থেকেই নয়, সারা বিশ্বের বিত্তশালী শহরগুলোর মধ্যে মুম্বই এগিয়ে আছে ওয়াশিংটন, মস্কো বা টরোন্টোর থেকেও।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'সিটি ওয়েল্‌থ ইনডেক্স'-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, তাবড় প্রতিপক্ষকে পিছনে ফেলে ২১ নম্বরে নিজের নাম তুলেছে ভারতের বাণিজ্য নগরী। রাজধানী দিল্লি ৩৫ নম্বরে। বিশ্বের ৮৯-টি দেশের ১২৫-টি শহরকে এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নাগরিকদের বিনিয়োগের পরিমাণ ও জীবনযাত্রার মানের উপর ভিত্তি করে সমীক্ষা চালায় সংস্থাটি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, 'আল্ট্রাহাই নেট ওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়াল' (ইউএইচএনডব্লিউআই) বা অতি বড়োলোকের সংখ্যা গত দশকে ভারতে বেড়েছে ২৯০ শতাংশ। মুম্বইতে অতি বড়োলোক ১,৩৪০ জন। এর পর দিল্লি (৬৮০ জন), কলকাতা (২৮০ জন), হায়দরাবাদ (২৬০ জন)। অতি বড়োলোকের সংখ্যা বৃদ্ধির হারে দেশে প্রথম স্থানে রয়েছে পুণে। পুণেতে ইউএইচএনডব্লিউআই বেড়েছে ১৮ শতাংশ। হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুতে বৃদ্ধি ১৫ শতাংশ। মুম্বইয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ ১২ শতাংশ। এর পরে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ে তালিকার পঞ্চম স্থানে কলকাতা, দিল্লি ও চেন্নাই। তবে ভবিষ্যতে বিত্তশালী শহরগুলোর বা 'ফিউচার ওয়েল্‌থ'-এর তালিকায় ৪০-টি শহরের মধ্যে সিডনি, শিকাগো, প্যারিস, দুবাইকে ছাপিয়ে মুম্বই উঠে আসবে ১১ নম্বরে।

● **কর সংস্কারের প্রস্তাব আন্তর্জাতিক সংস্থার :**

জিএসটি চালুর পাশাপাশি আয়কর ও কর্পোরেট করেরও সংস্কার প্রয়োজন। কর্পোরেট করের হার ৭৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির উপর কর বসাতে হবে। পরিকাঠামোয় ঢালার মতো যথেষ্ট অর্থ থাকবে কেন্দ্রের কোষাগারে। আর্থিক বৃদ্ধিকে চাঙ্গা ও তার সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে গত পয়লা মার্চ এমনই সুপারিশ করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওইসিডি (অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)।

ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করে ওইসিডি-র সেক্রেটারি-জেনারেল অ্যাঞ্জেল গুর্রিয়া জানান, ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ আয়কর দেয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির তুলনায় যা বেশ কম। আরও বেশি মানুষকে করের আওতায় আনতে আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা না বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন অ্যাঞ্জেল। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার বেশি হলেও ওইসিডি-র সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংগঠিত ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান বাড়ছে না। আরও দু'টি বিষয় নিয়েও উদ্বিগ্ন ওইসিডি। বেসরকারি লগ্নিতে ভাটা এবং ব্যাংকগুলির অনাদায়ী ঋণের বোঝা। ভারতে শ্রম আইন সংস্কারের সুপারিশও করছে ওইসিডি।

● **নোট বাতিলের ধাক্কা সত্ত্বেও বৃদ্ধির হারে বিশ্বে শীর্ষে ভারতই :**

নোট বাতিলের ধাক্কা প্রভাব ফেলা সত্ত্বেও দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি-র বৃদ্ধির নিরিখে ভারত এখনও বিশ্ব অর্থনীতিতে এক নম্বরেই। অর্থাৎ, চলতি আর্থিক বছরেও বিশ্বের বড়ো দেশগুলির মধ্যে সব থেকে দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির দেশ ভারত। সাত শতাংশের উপরেই থাকবে জিডিপি-র হার। গত সাধারণ বাজেটে যে হার ধরা হয়েছিল, তার খুব একটা হেরফের হচ্ছে না। প্রথম ত্রৈমাসিক, অর্থাৎ, এপ্রিল-জুনে দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.২ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক, অর্থাৎ, জুলাই-সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে হয় ৭.৪ শতাংশ।

তৃতীয় ত্রৈমাসিক, অক্টোবর-ডিসেম্বরের মাঝখানেই গত ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশজুড়ে ৫০০ ও ১০০০-এর নোট বাতিলের ঘোষণা করেন। প্রভাব গোটা দেশের অর্থনীতিতেই পড়ে। অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা ছিল, জিডিপি বৃদ্ধির হার নেমে যাবে ৬.৪ শতাংশে। কিন্তু, ডিসেম্বরের শেষে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭ শতাংশে। চিনের মতো দেশে অক্টোবর-ডিসেম্বর, অর্থাৎ তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত যা হিসাব, তাতে চলতি আর্থিক বছরে এ দেশে বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৭.১ শতাংশ।

● **উঠে গেল নগদ তোলার সাপ্তাহিক সীমা :**

গত ১৩ মার্চ থেকে উঠে গেল সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে (ব্যাংকে গিয়ে ও এটিএম মারফৎ) নগদ টাকা তোলার সাপ্তাহিক সীমা। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার উপর রাশ অবশ্য তুলে নেওয়া হয়েছে আগেই। কোনও বিধিনিষেধ নেই 'ওভারড্রাফ্‌ট' এবং 'ক্যাশ-ক্রেডিট' অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও।

প্রসঙ্গত, গত ৮ নভেম্বর পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের পরে বাজারে নোটের জোগান কম থাকায়, নগদের ব্যবহারে রাশ টানার লক্ষ্যে টাকা তোলার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। বাজারে পর্যাপ্ত নতুন নোটের জোগান আসলে টাকা তোলায় জারি বিধিনিষেধ ধাপে ধাপে শিথিল হতে থাকে। তিন মাসের লাগাতার নিয়ন্ত্রণে ইতি টেনে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে এটিএম-এ টাকা তোলার দৈনিক সীমা (ডেবিট কার্ড পিছু ১০ হাজার টাকা) তুলে দেয় রিজার্ভ ব্যাংক। তবে ব্যাংক এবং এটিএম মিলিয়ে সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে সপ্তাহে ২৪ হাজার তোলার সীমা তখনও বহাল ছিল। ৮ ফেব্রুয়ারি, চলতি আর্থিক বছরের শেষে ঋণনীতি ঘোষণার পরে আরবিআই জানায়, ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে সেভিংস অ্যাকাউন্টের টাকা তোলার সীমা সপ্তাহে ২৪ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হবে এবং ১৩ মার্চ থেকে তা পুরোপুরি তুলে নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, দেশের অর্থনীতিতে ইতোমধ্যেই ঢুকে পড়েছে ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নতুন নোট। যেখানে নিষেধাজ্ঞা জারির সময়ে মোট ১৫.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের পুরোনো পাঁচশো, হাজার তুলে নেওয়া হয় বাজার থেকে।

● **সাড়া নেই কেন্দ্রের সোনা জমা প্রকল্পে :**

প্রত্যাশা মতো সাড়া মিলছে না কেন্দ্রীয় সরকারের সোনা জমা প্রকল্পে। গৃহস্থের কাছে ও বিভিন্ন মন্দিরে প্রায় ২৪ হাজার টন সোনা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প চালুর ১৬ মাস বাদেও ব্যাংকে জমা পড়েছে

মাত্র ৭ টন সোনা। সোনা সুদের বিনিময়ে ব্যাংকে জমা রাখার প্রকল্প কেন্দ্র চালু করে ২০১৫-র নভেম্বরে। লক্ষ্য ওই সোনা গলিয়ে গয়না প্রস্তুতকারীদের জোগান দেওয়া, যাতে সোনা আমদানিতে রাশ টানা যায়। কিন্তু সামান্য সুদ (হার বছরে মাত্র ২.৫ শতাংশ) ও সেই সঙ্গে খাদ বাদ দিয়ে খাঁটি সোনা বার করে আনার খরচের কারণে (সোনার মালিককেই এই খরচ দিতে হয়) অনেকেরই এই প্রকল্প পছন্দ হয়নি।

উল্লেখ্য, ভারত বিশ্বে সোনা আমদানিতে দ্বিতীয়। প্রথম স্থান দখলে রেখেছে চিন। সোনা আমদানি খাতে বিপুল বিদেশি মুদ্রার খরচে লাগাম পরাতেই এই প্রকল্প চালু করে কেন্দ্র। কিন্তু যে-সমস্ত পরিবারের হাতে দেশের ৮০ শতাংশ সোনা গচ্ছিত, তারা কার্যত প্রকল্পে সামিলই হয়নি বলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব হলমার্কিং সেন্টার্সের তরফে তথ্য মিলেছে। এমন কি গয়না কতটা খাঁটি, তা পরীক্ষার জন্য খোলা প্রায় ৫০-টি সরকার অনুমোদিত কেন্দ্রে এখনও গৃহস্থের ১ গ্রাম সোনাও জমা হয়নি। যেটুকু জমা পড়ছে, তা মূলত মন্দিরগুলি থেকে।

● **টেলিনরকে কিনছে এয়ারটেল :**

এয়ারটেলের কাছে নিজেদের ভারতীয় ব্যবসা বিক্রি করে এ দেশ ছাড়ার ঘোষণা করল টেলিনর। ভারতে টেলি পরিষেবা বাজারে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। টিকে থাকতে এয়ারসেল ও এমটিএস-কে কেনার কথা জানিয়েছে রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন্স (আর-কম)। গাঁটছড়া বাঁধার কথা চলছে ভোডাফোন ইন্ডিয়া ও আইডিয়ার। এর মধ্যেই গত ২৩ ফেব্রুয়ারি টেলিনরের ব্যবসা কেনার কথা জানায় দেশের বৃহত্তম টেলি-পরিষেবা সংস্থা এয়ারটেল। নরওয়ের সংস্থাটিকে এ জন্য ভারতী গোষ্ঠী (এয়ারটেল যার সংস্থা) কোনও নগদ অর্থ দেবে না। বদলে দায় নেবে টেলিনরের বকেয়া স্পেকট্রাম-লাইসেন্স ফি এবং টাওয়ার ব্যবহারের খরচের। চুক্তি অনুযায়ী ভারতে টেলিনরের সম্পত্তি, পরিকাঠামো ও গ্রাহক—সবই চলে আসবে ভারতী গোষ্ঠী হাতে।

মুকেশ অম্বানীর সংস্থা জিও পা রাখার পরে আমূল বদলে যাচ্ছে টেলি-পরিষেবা বাজারের ছবি। টেলি-পরিষেবা সংস্থাগুলি বুঝেছে, আগামী দিনে যাবতীয় যুদ্ধ হবে নেট পরিষেবাকে ঘিরে। বিশেষত জিও আসার পরে তা স্পষ্ট। মুকেশ অম্বানীর সংস্থাটি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় কম মাসুলে নেট পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তো বটেই, মোবাইলে দ্রুতগতির ৪জি ডেটা পৌঁছে দেওয়ার কথা বলছে ব্রডব্যান্ডের থেকেও কম খরচে। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের টাওয়ারের সংখ্যা ও অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল বাড়াতে চাইছে অন্যান্য সংস্থাগুলি।

ভোডাফোন-আইডিয়া জোট হলে, সম্মিলিত গ্রাহক সংখ্যা হবে ৩৭.৫ কোটি। পিছনে ফেলে দেবে এখন শীর্ষে থাকা এয়ারটেলকে (২৬.৯ কোটি)। কিন্তু দেশের সাত সার্কেলে টেলিনরের ব্যবসা কিনে মোট ৩১.৪ কোটি গ্রাহক সংখ্যা নিয়ে অন্তত ভোডাফোন-আইডিয়ার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে চলেছে এয়ারটেল। একই সঙ্গে, তাদের হাতে আসছে টেলিনরের ১৮০০ মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডের ৪৩.৪ মেগাহার্ৎজ স্পেকট্রাম। সঙ্গে নরওয়ের সংস্থাটির সব টাওয়ারও। যা ব্যবহার করে ৪জি পরিষেবা দিতে সুবিধা হবে তাদের।

● **গ্র্যাচুইটির সীমা দ্বিগুণের দিতে এগোচ্ছে কেন্দ্র :**

সর্বোচ্চ গ্র্যাচুইটির সীমা দ্বিগুণ করে ২০ লক্ষ টাকা করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলিও। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন শ্রমমন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেয়। সরকার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে ঐকমত্য হয়। গ্র্যাচুইটি আইনের ৪(৩) ধারা মতে বর্তমানে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে কোনও কর্মী ১০ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটি পেতে পারেন। আইন সংশোধন করে ওই ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর প্রস্তাবে সায় দেওয়ার পাশাপাশি গ্র্যাচুইটির হার বাড়ানো-সহ আরও কিছু দাবি পেশ করেছে শ্রমমন্ত্রীর কাছে।

➔ হার বাড়িয়ে প্রতি এক বছর কাজের জন্য ৪৫ দিন করা। (বর্তমানে প্রতি ১ বছর কাজ করার জন্য ১৫ দিনের বেতন গ্র্যাচুইটি হিসাবে প্রাপ্য হয় কর্মীদের। ২৬ দিনে মাস ধরে ওই ১৫ দিনের বেতন হিসাব করা হয়। ১৫ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিনের বেতন গ্র্যাচুইটি হিসাবে দেওয়ার প্রস্তাব।)

➔ চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ৫ বছর থেকে কমিয়ে আনা। (বর্তমান আইনে দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া কোনও কর্মী কমপক্ষে ৫ বছর টানা কাজ করার পরে তবেই গ্র্যাচুইটি পাওয়ার হকদার হন। ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবি ২৪০ দিন টানা কাজ করার পরেই যাতে কর্মীরা গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী হন, সেই মর্মে আইন সংশোধন করা হোক।)

● **পিএপ-এ আসতে পারেন আরও ৬০ লক্ষ কর্মী :**

কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডে (ইপিএফ) সদস্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকল্প চালু হয়েছে আগেই। যাতে নিয়োগকর্তারা আরও বেশি কর্মীকে এর আওতায় আনতে উদ্যোগী হন। ইপিএফ কর্তৃপক্ষের দাবি, এর দৌলতে আগামী দিনে দেশ জুড়ে আরও প্রায় ৬০ লক্ষ কর্মী পিএফ-বৃত্তে ঢুকতে পারেন। নিয়োগকর্তা যোগ্য কর্মীদের পিএফ-এর আওতায় না আনলে তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী দফায় নেওয়া হতে পারে ব্যবস্থাও। কর্মীদের পিএফ-এ সামিল করতে উদ্যোগী হচ্ছেন না অনেক নিয়োগকর্তা—এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্প্রতি ইপিএফ কর্তৃপক্ষ নিয়োগকর্তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে প্রকল্প ঘোষণা করেন। সুবিধাগুলির মধ্যে অন্যতম দু'টি হল; প্রথমত, ২০১৬-র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যাদের পিএফ-এর আওতায় আনা হয়নি, এবার তাদের সেই সুযোগ দিলে নিয়োগকর্তার ক্ষতিপূরণ প্রায় পুরোটাই মকুব হবে। বছরে শুধু ১ টাকা করে দিয়েই রেহাই পাবেন তিনি। পিএফ আইনের ১৪বি ধারায় ওই ক্ষতিপূরণের অংক ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, পিএফ-এর আওতায় আনা নতুন সদস্যের জন্য কোনও পরিচালন খরচ বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চার্জও নেওয়া হবে না নিয়োগকারীর কাছ থেকে।

পিএফ উৎসাহ প্রকল্পটি ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু থাকবে। সময়সীমার কাছাকাছি পৌঁছে পিএফ কর্তৃপক্ষের দাবি, এর আওতায় দেশের আরও ৬০ লক্ষ কর্মী যোগ হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। সংখ্যাটা আরও বেড়ে ১ কোটির কাছাকাছিও পৌঁছে যেতে পারে। কলকাতায় ৩৯

হাজার নতুন সদস্যকে সামিল করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছিল। সেখানে পিএফ উৎসাহ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ৫০ হাজারেরও বেশি নতুন সদস্য নথিভুক্ত হয়েছেন। নিয়োগকর্তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিএফ খাতে তাদের দেয় অংকের পরিমাণ কমানোর প্রস্তাবও খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র। এর মধ্যে রয়েছে নির্মাণ, বিড়ি, ইট ভাটা-সহ আরও কয়েকটি শিল্প।

● **অভিযুক্ত ঘোষণা স্যামসাং-কর্তাকে :**

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘুষ-কাণ্ডে সরকারিভাবে অভিযুক্ত ঘোষণা করা হল স্যামসাং গোষ্ঠীর প্রধান জে. ওয়াই. লি-কে। গোষ্ঠীর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সন্তান লি-র বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক গুন হে-র দীর্ঘ দিনের বন্ধু চোয়ে সুনসিল-কে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ আনেন সরকারি কৌঁসুলিরা। এই সঙ্গে জালিয়াতি, প্রতারণা ও বিদেশে সম্পত্তির লুকোনোর অভিযোগও আছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় লি-কে। স্যামসাং কর্ণধারের সঙ্গে সংস্থার অন্য চার কর্তার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ। লি বাদে বাকি অভিযুক্তের মধ্যে তিন জন ইতোমধ্যেই স্যামসাং থেকে পদত্যাগ করেছেন। এই কেলেঙ্কারির জেরে ইতোমধ্যেই ইমপিচ করা হয়েছে প্রেসিডেন্টকে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে গোষ্ঠীর দুই সংস্থা স্যামসাং সি অ্যান্ড টি এবং চেইল ইন্ডাস্ট্রিজ মেশানোর সিদ্ধান্ত নিলে শেয়ারহোল্ডাররা আপত্তি তোলেন। তখনই সুন-এর অ-সরকারি সংস্থাকে ৩.৭৭ কোটি ডলার ঘুষ দেওয়া হয়। বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি পেনশন তহবিল (সংস্থার বড়ো শেয়ারহোল্ডার) এতে সায় দেয়। সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন লি এবং স্যামসাং।

● **ডাকঘর পেমেন্টস ব্যাংক বছরের মাঝামাঝি :**

দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, এখনও বহু স্থানে তা অমিল। সেই ঘাটতি পূরণে কেন্দ্র ও রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) 'পেমেন্টস ব্যাংক' তৈরির কথা জানায়। ছাড়পত্র পাওয়া ১১-টি আবেদনের মধ্যে অন্যতম ডাক বিভাগ, প্রত্যন্ত এলাকাতেও যাদের উপস্থিতি রয়েছে। এই ব্যাংক খুলতে ডাক বিভাগের অধীনে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক (আইপিপিবি) নামে আলাদা সংস্থাও তৈরি হয়েছে।

আপাতত রায়পুর ও রাঁচিতে ডাক বিভাগের দু'টি পাইলট প্রকল্প চলছে। ধাপে ধাপে দেশের প্রায় ১.৫ লক্ষ ডাকঘরে এই পরিষেবা চালু হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৬৫০-টি শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে ডাক বিভাগের। এ রাজ্যে যার সদর দপ্তর হবে কলকাতা জিপিও। এছাড়া একটি আঞ্চলিক ও একটি বিভাগীয় অফিস হবে। রাজ্যের সব ডাকঘরেই ধাপে ধাপে (প্রায় ন'হাজার) খোলা হবে আইপিপিবি-র শাখা। ডাকপিওনরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে এই পরিষেবা দেবেন। তাদের ভূমিকা হবে বিভিন্ন ব্যাংকের 'বিজনেস করেসপন্ডেন্টস'-দের মতো। ডাকপিওন দু' ধরনের হন। একদল সরাসরি ডাক বিভাগের কর্মী। অন্য দল চুক্তির ভিত্তিতে কাজের জন্য নিযুক্ত গ্রামীণ ডাক সেবক। রাজ্যে এখন প্রায় ৬ হাজার ডাকপিওন ও ১২ হাজার গ্রামীণ ডাক সেবক রয়েছেন। সবাইকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ডাকঘর সেভিংস অ্যাকাউন্টে বার্ষিক সুদ ৪ শতাংশ। আইপিপিবি-তে বিভিন্ন অংকের জমায় ৪.৫-৫.৫ শতাংশ সুদ মিলবে। সদ্য চালু হওয়া এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাংক অবশ্য ৭.২৫ শতাংশ সুদ দিচ্ছে। আইপিপিবি-তে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জমা রাখা যাবে। কোনও ঋণ মিলবে না। খোলা যাবে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট-ও।

● **ডোকোমোর সঙ্গে রফা টাটা সন্সের :**

লন্ডনের আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ মেনে ১১৮ কোটি মার্কিন ডলারে এককালের জাপানি সহযোগী 'এনটিটি ডোকোমো'-র শেয়ার কিনে নেবে টাটা গোষ্ঠীর মূল সংস্থা টাটা সন্স। পরিবর্তে আগামী দিনে অন্যান্য দেশে আইনি লড়াই থেকে সরে আসার আশ্বাস দিয়েছে ডোকোমো।

২০০৯ সালে ১২,৭৪০ কোটি টাকায় টাটা টেলি সার্ভিসেস-এর ২৬.৫ শতাংশ অংশীদারি কেনে ডোকোমো। শেয়ার পিছু দর দেয় ১১৭ টাকা। শর্ত ছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে জোট ভাঙলে অন্তত ওই টাকার ৫০ শতাংশ পাবে তারা। ২০১৪-র এপ্রিলে গাঁটছড়া ভাঙলে টাটাদের কাছে হয় শেয়ার পিছু ৫৮ টাকা নয়তো এক লপ্তে ৭,২০০ কোটি টাকা দাবি করে ডোকোমো। কিন্তু টাটারা বলেছিল, রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম মেনেই প্রতি শেয়ারে ২৩.৩৪ টাকার বেশি দেওয়া সম্ভব নয়। এ নিয়ে লন্ডনে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতে যায় জাপানি সংস্থা। সেখানে ডোকোমোকে ১১৭ কোটি ডলার দিতে বলা হয় টাটাদের। আপত্তি তুলে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করে টাকা গোষ্ঠী।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি টাটা সন্স জানায়, বিতর্কে ইতি টানতে দু'পক্ষই আদালতের নির্দেশ কার্যকরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগেই আদালতে ১১৮ কোটি ডলার জমা করেছিল টাটা গোষ্ঠী। এখন আদালত সায় দিলে ওই অর্থ ডোকোমো-কে দেওয়া হবে এবং তারা টাটা টেলি সার্ভিসেস-কে নিজেদের শেয়ার হস্তান্তর করবে।

● **১০ হাজার কোটি কর গুনতে নির্দেশ কেয়ার্নকে :**

ব্রিটিশ তেল-গ্যাস সংস্থা কেয়ার্ন এনার্জি ভারত সরকারকে ১০,২৪৭ কোটি টাকা মূলধনী লাভ কর দিতে দায়বদ্ধ বলে জানিয়ে দিল আয়কর আপিল আদালত। নির্দেশে বলা হয়েছে, সংস্থাটি ২০০৬ সালে নিজেদের ঢেলে সাজানোর অঙ্গ হিসেবেই ভারতীয় ব্যবসা কেয়ার্ন ইন্ডিয়ায় তাদের শেয়ার হস্তান্তর করেছিল। তখন কেয়ার্ন ইন্ডিয়া এ দেশের শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হয়নি। ফলে মূলধনী লাভ কর চোকাতে দায়বদ্ধ তারা। তবে পুরোনো লেনদেনের উপর ধার্য ওই করে সুদ বাবদ টাকা সংস্থার থেকে নেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে আপিল আদালত। কারণ, এ দেশে পুরোনো লেনদেনের জন্য কর আদায়ের আইন অনুযায়ী তার পরিমাণ এমনিতেই বেড়েছে। এর আগে আয়কর দপ্তর ১৮,৮০০ কোটি টাকা সুদ (লেনদেনের সময় থেকে) হিসেব করে কেয়ার্নের থেকে সাকুল্যে ২৯,০৪৭ কোটি টাকা দাবি করেছিল। একই রকম কর চোকানোর দাবি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল তাদের ভারতীয় শাখা কেয়ার্ন ইন্ডিয়াকেও। যে সংস্থাটিকে গত ২০১১ সালে অনিল অগ্রবালের বেদান্ত গোষ্ঠীর কাছে বিক্রি করেছে কেয়ার্ন এনার্জি। আপিল আদালত অবশ্য বলেছে,

মূল সংস্থার ঘরে ঢোকা মূলধনী লাভের জন্য কেয়ার্ন ইন্ডিয়া যেন কর বইতে না যায়। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে আয়কর দপ্তরের কাছ থেকে ১০,২৪৭ কোটি টাকা কর মেটানোর নির্দেশ পাওয়ার পরেই আয়কর আপিল আদালতে যায় কেয়ার্ন এনার্জি। পরে তারা বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতেও গিয়েছে। তবে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি সেখানে।

● **ভারতের বিরুদ্ধে ডব্লিউটিও-তে অভিযোগ জাপানের :**

ইস্পাতে চড়া আমদানি শুল্ক বসানোয় ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র দ্বারস্থ জাপান। দেশি শিল্পকে সুরক্ষিত রাখতে এই শুল্ক বসিয়ে ভারত ডব্লিউটিও আইন ভেঙেছে বলে অভিযোগ জাপানের অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত ব্যুরোর। ইস্পাত আমদানি নিয়ে ভারতের সঙ্গে টানা-পোড়েনে ইতি টানতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে একটি কমিটি গড়তে অনুরোধ করেছে জাপান।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইস্পাতের চাদর ও অন্য কিছু পণ্য আমদানিতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসায় ভারত। ২০১৬ সালে ইস্পাত পণ্য আমদানির জন্য বেঁধে দেয় ন্যূনতম দরও। জাপান, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করা ইস্পাত যাতে ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলতে না পারে, তার জন্যই চড়া শুল্ককে হাতিয়ার করে ভারত। ফেব্রুয়ারি মাসে ওই দাম বেঁধে দেওয়া থেকে সরে এলেও এখনও বহাল রাখা হয়েছে চড়া আমদানি শুল্ক। জাপানের অভিযোগ, এই শুল্ক ডব্লিউটিও আইনের সঙ্গে খাপ খায় না। এর জেরে ২০১৬ সালে জাপানি ইস্পাতের ক্রেতার তালিকায় ভারত নেমে এসেছে আট নম্বরে। ২০১৫ সালে তারা ছিল তৃতীয়। সমস্যাটি আপসে মিটিয়ে নিতে দু'পক্ষের আলোচনা ভেস্তে যায় ফেব্রুয়ারির গোড়াতে। তাই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পথ থেকে সরে এসে ডব্লিউটিও-র কাছে নালিশ। সেই সঙ্গেই একটি কমিটি গড়ে রফাসূত্র খুঁজতে বলছে জাপান। ২০১১ থেকে অবাধ বাণিজ্য চুক্তির আওতায় রয়েছে ভারত ও জাপান। তবে ইস্পাতকে এর বাইরে রাখতে চায় ভারতীয় শিল্পমহল। মুক্ত বাণিজ্যের জমানায় দু'পক্ষের সায় ছাড়া অবশ্য তা সম্ভব নয়।

● **জিপিএফ থেকে টাকা তোলার নিয়ম সরল :**

প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীকে সুবিধা দিতে আইন সংশোধন করে সরল করা হল জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ) থেকে টাকা তোলার নিয়ম-কানুন। নতুন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা নিজের বা পরিবারের কারও চিকিৎসার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা টাকার ৯০ শতাংশই তুলে নিতে পারবেন। আর তা পাওয়া যাবে সাত দিনেই। কিছু ক্ষেত্রে কর্মীরা টাকা তুলতে পারবেন চাকরির ১০ বছর সম্পূর্ণ হলে। আগে সেই মেয়াদ ছিল ১৫ বছর।

বাগ্‌দান থেকে বিয়ে, শেষকৃত্যের মতো বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, এমনকী গাড়ি, মোটর সাইকেল, ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি কেনা এবং প্রাথমিক স্তর থেকে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ মেটানোর জন্যও জিপিএফ-এর টাকা তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আবেদন করার সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যেই যাতে তা মঞ্জুর করে টাকা দেওয়া হয়। এর জন্য কোনও নথিও জমা দিতে হবে না। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা কোনও কারণ না দেখিয়ে পিএফ-এর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত তুলতে পারেন অবসরের এক বছর আগে।

● **গাড়ি বিমা, প্রিমিয়াম বাড়ানোর প্রস্তাব :**

গাড়ি বিমার প্রিমিয়াম ৫০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইআরডিএ-র। আওতায় আসবে যাত্রী গাড়ি, মোটর সাইকেল ও বাণিজ্যিক যান। পয়লা এপ্রিল থেকে নতুন হার চালু করতে চায় তারা। তবে ছোটো গাড়ির (১,০০০ সিসি পর্যন্ত) তৃতীয় পক্ষ বিমা এখনকার ২,০৫৫ টাকাই রাখা হচ্ছে। ৭৫ সিসি পর্যন্ত দু' চাকার যানকেও এর বাইরে রাখা হয়েছে। আইআরডিএ ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের জন্য পেশ করা খসড়া প্রস্তাবে এই সুপারিশ করেছে। এতে মতামত জানানো যাবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত।

১,০০০ সিসি-র উপর থেকে ১,৫০০ সিসি পর্যন্ত মাঝারি মাপের গাড়ির এবং সেই সঙ্গে তুলনায় কিছুটা বড়ো ও এসইউভি-র জন্য প্রিমিয়াম ৫০ শতাংশ বাড়ানোর পক্ষে মত। মাঝারি গাড়ির জন্য ৩,৩৫৫ টাকা, বড়ো গাড়ির জন্য ৯,২৪৬ টাকা করার প্রস্তাব। ৩৫০ সিসি-র বেশি স্পোর্টস বাইক ও সুপার বাইকের প্রিমিয়াম ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ১,১৯৪ করতে বলেছে আইআরডিএ। বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে ৭৭-১৫০ সিসি এবং ১৫০-৩৫০ সিসি-র বাইকেও। মালবাহী গাড়ির প্রিমিয়ামও ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে প্রস্তাব। ৬ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত ট্রাক্টরের প্রিমিয়াম ৫১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৬৫ টাকা করার কথা। ই-রিক্‌শ-র প্রিমিয়ামও বাড়াতে মত। তবে ভিন্টেজ গাড়ির জন্য ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব। প্রসঙ্গত, ভিন্টেজ অ্যান্ড ক্লাসিক কার ক্লাব অব ইন্ডিয়া-ই স্থির করে একটি গাড়িকে ভিন্টেজ বলে গণ্য করা যাবে কিনা। সেই অনুযায়ী তারা শংসাপত্রও দেয়।

● **আঙুলের ছাপে কেনাকাটা 'আধার'-এ :**

দাম মেটাতে শুধু চাই ক্রেতার আধার নম্বর ও আঙুলের ছাপ। নগদহীন লেনদেন আরও এক ধাপ এগিয়ে এই পথে হাঁটল আইইডিএফসি ব্যাংকের হাত ধরে। তিন মাস ধরে ১৬-টি রাজ্যে পরীক্ষার পরে গত ৭ মার্চ দিল্লিতে 'আধার পে' অ্যাপটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হল।

এক্ষেত্রে ক্রেতার আধার নম্বর তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। অন্য দিকে, বিভিন্ন সংস্থা (মার্চেন্ট) আইডিএফসি ব্যাংকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ব্যাংকের 'আধার পে' অ্যাপটি তাদের স্মার্টফোনে ডাউনলোড করবে। সঙ্গে থাকবে ক্রেতার আঙুলের ছাপ নেওয়ার আলাদা যন্ত্র। কেনাকাটার পরে সংস্থাটির মোবাইলের ওই অ্যাপে ক্রেতা তার যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট, রয়েছে সেটি বেছে নেবেন ও তার আধার নম্বর দেবেন। পাশাপাশি, যন্ত্রটিতে আঙুল ছোঁয়াবেন। আঙুলের ছাপই হবে লেনদেনের 'পাসওয়ার্ড'। আধারের তথ্য ভাণ্ডারের সঙ্গে আঙুলের ছাপ মিললেই লেনদেন সম্পূর্ণ হবে। আগামী দু' বছরের মধ্যে ৫০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে ব্যাংকটি।

● **পি এফ-এর টাকায় বাড়ির কিস্তি মার্চ থেকে :**

এবার কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডে (ইপিএফ) জমানো টাকা থেকে মেটানো যাবে বাড়ি-ফ্ল্যাটের মাসিক কিস্তি (ইএমআই)। এ জন্য মার্চ থেকেই নতুন প্রকল্প চালু করতে চলেছে পিএফ কর্তৃপক্ষ। যে সমস্ত সদস্য বাড়ি-ফ্ল্যাট কিনতে ব্যাংকের কাছে ঋণ নেবেন, তারা নিজেদের পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা টাকা থেকেই মেটাতে পারবেন ওই ঋণের কিস্তি। বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে প্রথমে থোক টাকা দিতে হলে, তারও সংস্থান করা যাবে সদস্যের পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা টাকা থেকে। অবসরের পরে সেই টাকা কেটে বাকিটুকু সুদ-সহ হাতে পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো সরকারি আওতায় বাড়ি-ফ্ল্যাট কিনলেও এই সুবিধা মিলবে। যারা ঋণ নেবেন, তাদের ধার শোধের ক্ষমতা থাকার সার্টিফিকেটও দেবে পিএফ দপ্তর। বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে আবেদনকারীকে প্রমাণ করতে হয় যে, তার ধার শোধের ক্ষমতা রয়েছে।

নতুন প্রকল্পের সুবিধা নিতে প্রথমত, চাকরিতে থাকার সময়ের মধ্যেই ওই প্রকল্পে সামিল হতে হবে। দ্বিতীয়ত, অন্তত ২০ জন মিলে গড়তে হবে একটি আবাসন সমবায় সমিতি। ওই সমিতিতে সামিল হতে হবে নিয়োগকারীকেও। এর পর ওই সমিতিকে ঋণের জন্য চুক্তি করতে হবে ব্যাংকের সঙ্গে। পাশাপাশি, চুক্তি সারতে হবে প্রোমোটারের সঙ্গেও। পিএফ কর্তৃপক্ষ অবশ্য ঋণ শোধের ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি দেবেন না। ব্যাংক ঋণ নেওয়ার পরে কোনও ধরনের মামলা হলে, তার সঙ্গে পিএফ কর্তৃপক্ষ নিজেদের জড়াবে না। আইনি জটিলতা সংশ্লিষ্ট পিএফ সদস্য, ব্যাংক ও প্রোমোটারকেই নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করতে হবে।

● **কেব্‌ল টিভি, 'ফ্রি টু এয়ার' চ্যানেল দেখার খরচ বাড়ছে :**

১০০-টি 'ফ্রি টু এয়ার' চ্যানেলের জন্য এবার থেকে কর বাদ দিয়ে গ্রাহকদের দিতে হবে ১৩০ টাকা। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ট্রাই) নির্দেশ দিয়েছে, ওই সব 'স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন' (এসডি) চ্যানেলের ক্ষেত্রে এর বেশি অর্থ নেওয়া যাবে না। এর পর অতিরিক্ত এফটিএ চ্যানেল দেখতে প্রতি ২৫-টি চ্যানেলের জন্য গ্রাহক দেবেন ২০ টাকা করে। পরিষেবা ও বিনোদন কর আলাদা। 'পে-চ্যানেল' দেখার জন্যও বাড়তি কড়ি গুনতে হবে গ্রাহকদের। এক একটি চ্যানেল হোক বা একগুচ্ছ, উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, এফটিএ চ্যানেলগুলি এসডি চ্যানেল। গুণগত মানে উন্নত চ্যানেল (হাই ডেফিনিশন বা এইচডি) বাড়তি কড়ি দিয়েই গ্রাহকদের দেখতে হয়। এগুল 'পে-চ্যানেল'-এর মধ্যে পড়ে। ট্রাই জানিয়েছে, প্রতি মাসে তাদের বাছাই করা পে-চ্যানেলগুলির সর্বোচ্চ মাসুল (এমআরপি) কত, জানাতে হবে 'ব্রডকাস্টার' বা চ্যানেল পরিবেশন সংস্থাকে। এছাড়াও বছরে তিন মাস পর্যন্ত গ্রাহক এই পরিষেবা নেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে পারেন বলেও নির্দেশ দিয়েছে ট্রাই।

● **জুলাই-এ জিএসটি-র পথে আর এক ধাপ :**

গত ৪ মার্চের বৈঠকে কেন্দ্রের বসানো জিএসটি (সিজিএসটি) এবং কেন্দ্র-রাজ্য মিলে বসানো জিএসটি (আইজিএসটি) নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায় পরিষদ। এছাড়াও ঠিক হয়,

➔ বছরে ব্যবসা ২০ লক্ষ টাকার কম হলে, জিএসটি বাধ্যতামূলক নয়।

➔ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করা রেস্তোরাঁ, ধাবা, হোটেলকে কর দিতে হবে ৫ শতাংশ হারে; যে-টাকা অর্ধেক করে ভাগ হবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে।

➔ সর্বোচ্চ হার (এখন ২৮ শতাংশ) বাড়ানোর সুযোগ খোলা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। যাতে তার জন্য বারবার সংসদের সায় না-লাগে।

➔ পরের বৈঠক ১৬ মার্চ।

পরের বৈঠকে আলোচনার বিষয় :

➔ এসজিএসটি এবং ইউটিজিএসটি নিয়ে খসড়া বিলে ঐকমত্য।

➔ চার রকম জিএসটি-তেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সায়।

➔ ৯ মার্চ থেকে শুরু হওয়া বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফায় জিএসটি-র যাবতীয় বিল পেশ।

➔ সিজিএসটি, আইজিএসটি বিল সংসদে এবং এসজিএসটি বিল বিধানসভায় পাস [কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিজস্ব বিধানসভা থাকলে (যেমন, দিল্লি), ইউটিজিএসটি পাস করাতে হবে সেখানে, নইলে সংসদে।]

➔ কোন পণ্য, পরিষেবায় কী হারে কর, তা ঠিক করবেন অফিসাররা। পরিষদের বৈঠকে তাতে সায়।

➔ পয়লা জুলাই থেকে জিএসটি চালু।

● **নগদ লেনদেনে চড়া ফি ব্যাংকের :**

ব্যাংকের শাখায় গিয়ে মাসে মাত্র চারটি নগদ লেনদেন নিখরচায়। এইচডিএফসি, আইসিআইসিআই, অ্যাক্সিস-সহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকে এখন থেকে মাসে চারবারের বেশি নগদ লেনদেনে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। মাসের প্রথম চারবারের পর টাকা তোলা বা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ৫ টাকা থেকে সর্বাধিক ১৫০ টাকা দিতে হবে গ্রাহককে। অ্যাক্সিস ব্যাংকের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে মাসের প্রথম পাঁচটি নগদ লেনদেন অথবা নগদ ১০ লক্ষ টাকার ক্ষেত্রে। সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু হল পয়লা মার্চ থেকে। থার্ড পার্টি লেনদেনও দৈনিক ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হল। আইসিআইসিআই ও অ্যাক্সিস ব্যাংকে অবশ্য এই নির্দেশগুলি কার্যকর করা হয়েছে জানুয়ারি মাস থেকেই। চেক, ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি লেনদেন কিংবা এটিএম-এ টাকা তোলা অবশ্য এর আওতায় পড়ছে না। মানুষকে আরও বেশি করে ডিজিট্যাল লেনদেনে উৎসাহ দিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসরকারি ব্যাংক সংস্থাগুলি। ব্যাংকের শাখায় গিয়ে নগদ লেনদেন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাড়ালে, তার জন্য ফি নেয় স্টেট ব্যাংকের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও।

এদিকে ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলে, তার থেকে ব্যাংকের আয় হয়। এই টাকা তুলনায় অনেক বেশি সুদে ঋণ দেয় তারা। তার পরেও কেন নগদ লেনদেনে এত ফি দিতে হবে, তা স্পষ্ট করা জরুরি। ব্যাংকের শাখায় নগদ লেনদেনে বর্ধিত চার্জ নিয়ে গ্রাহকদের ক্ষোভের পারদ চড়ছে টের পেয়ে

ব্যাংকগুলিকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে বার্তা দিয়ে কেন্দ্র। সেই সঙ্গে, সেভিংস অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালান্স রাখার যে-নিয়ম স্টেট ব্যাংক সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, তা-ও ফিরে দেখার নির্দেশ দিল তারা। প্রসঙ্গত, নোট বাতিলের পর থেকেই নগদ লেনদেনে রাশ টানার কথা বলছে কেন্দ্র। তিন লক্ষ টাকার বেশি নগদ লেনদেন আর করা যাবে না বলে বাজেটে ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

➢ সম্প্রতি ফিলিপিন্সের বিভিন্ন সৈকতে ভেসে এসেছে বেশ কিছু অদ্ভুত আকারের সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, জোরালো ভূমিকম্পের আভাস দিচ্ছে দেহগুলি। ফেব্রুয়ারি মাসে ফুট তিরিশেক লম্বা মাছের মতো কিছু প্রাণীর দেহ ভেসে আসার পর পরই দু'টি জোরালো কম্পনে কেঁপে ওঠে ফিলিপন্স। বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, সমুদ্রের ৩ হাজার ফুট গভীরে এদের বাস। সমুদ্রের তলায় কম্পনেই এদের মৃত্যু হয়েছে। একইভাবে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ১৫ ফুট লম্বা একটি লোমশ দেহাংশ ভেসে আসে। সেটি কোনও বিশালাকায় প্রাণীর অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।

● **বিবিসি নিষিদ্ধ কাজিরাঙ্গায় :**

ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলিতে বিবিসি ও তাদের সাংবাদিক জাস্টিন রাওলাটকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (এনটিসিএ)। এই নির্দেশের পিছনে রয়েছে বিবিসি-র একটি তথ্যচিত্র। যাতে দেখানো হয়েছিল, কাজিরাঙায় দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বনরক্ষীদের। ফলে নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। অথচ বাস্তবে তেমন নির্দেশ নেই। কাজিরাঙার অধিকর্তা সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও অসমের বনমন্ত্রী প্রমীলারানি ব্রহ্ম-এর মত, বিশেষ উদ্দেশ্যে বাইরের কোনও সংগঠনের প্ররোচনায় কাজিরাঙাকে খাটো করতেই তৈরি হয়েছে ওই তথ্যচিত্র। পরে ভারত সরকার ও এনটিসিএ ওই চ্যানেলকে নিষিদ্ধ করলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে কাজিরাঙার যথেষ্ট বদনাম রটেছে।

রাজ্য পর্যটনের দূত প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে গণ্ডারের ছবি-সহ অসম পর্যটনের প্রথম পোস্টার যখন প্রকাশ হয়েছে, ঠিক তখনই আন্তর্জাতিক সংগঠন 'সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল' বিশ্বের পর্যটকদের কাছে কাজিরাঙা বর্জনের আহ্বান জানায়। কাজিরাঙায় দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ নেই বলে রাজ্যের বক্তব্য মানতে নারাজ ওই সংগঠনের দাবি অসমের বনরক্ষীরা 'ট্রিগার হ্যাপি'। ইতোমধ্যে অস্কার জয়ী অভিনেতা মার্ক বিলেন্স, অভিনেত্রী গিলিয়ান অ্যান্ডারসন, চিত্রশিল্পী সার কুয়েন্টিন, সঙ্গীতজ্ঞ-ফটোগ্রাফার জুলিয়ান লেনন, অভিনেতা ডমিনিক ওয়েস্ট কাজিরাঙার বিরোধিতায় সরব। বিশ্বের দশটি দেশের ১৩১-টি পর্যটন সংস্থাকে কাজিরাঙা বয়কটের আর্জি জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

● **কাজিরাঙার বারাশিঙা মানসের জঙ্গলে :**

দ্বিতীয় দফায় আরও ১৭-টি 'ইস্টার্ন সোয়াম্প ডিয়ার' বা বারাশিঙা (স্থানীয় নাম, দল হিরণা) কাজিরাঙা থেকে মানসে পাঠাল অসম বন দপ্তর। পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে বারাশিঙার একমাত্র বসতি কাজিরাঙার জঙ্গল। কিন্তু মড়ক লাগলে, ব্যাপক বন্যা হলে বা ক্রমাগত 'ইনব্রিডিং'-এ বারাশিঙার সংখ্যা লোপ পেতে পারে বলে পশুপ্রেমীরা আশঙ্কায় ছিলেন। কাজিরাঙায় বারাশিঙার সংখ্যা হাজার ছাড়াতেই বিকল্প বাসস্থানের খোঁজ শুরু হয়। জঙ্গল ও ঘাসের প্রকৃতি যাচাইয়ের পরে বেছে নেওয়া হয় মানসকে। প্রথম দফায় পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৪ সালে ১৯-টি বারাশিঙা মানসে পাঠানো হয়। একটি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়; ১৮-টি জীবিত রয়েছে। তাদের বাচ্চাও হয়েছে। প্রতিস্থাপন সফল হওয়ায় ফের ২০-টি বারাশিঙাকে মানসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ধরা যায় ১৭-টিকে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি তাদের মানসের বাঁশবাড়ি রেঞ্জে নিয়ে গিয়ে পরের দিন রেঞ্জের জঙ্গলে ছাড়া হয়। বারাশিঙা সংরক্ষণে স্থানীয় মানুষের সহায়তাও খুব দরকার। তাই পশুপ্রেমী সংগঠনগুলির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে ডব্লউটিআই।

হরিণগুলির মধ্যে দু'টি পুরুষ, ১৫-টি স্ত্রী। তাদের আপাতত 'বোমা' বা নির্দিষ্ট নজরদারি ঘেরাটোপের মধ্যে রেখে দেখা হবে, নতুন পরিবেশে তারা মানাতে পারছে কি না? এক মাস পর 'রেডিও কলার' পরিয়ে ঘন জঙ্গলে ছাড়া হবে। কাজিরাঙায় এখন বারাশিঙার সংখ্যা ১ হাজার ১২৫-টি, মানসে ৪২-টি।

● **শীর্ষ আদালতের কড়া ভর্ৎসনা পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ সচিবকে :**

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'পর্যাবরণ সুরক্ষা সমিতি' ২০১২ সালে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নদী, জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ জলে দূষণ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করে সুপ্রিম কোর্টে। ৪৩-টি 'আশঙ্কাজনক দূষিত এলাকা' চিহ্নিত করে তারা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৩-টি এলাকা। নির্ধারিত ৩২-টি 'প্রচণ্ড দূষিত এলাকা'-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একটি। সেই মামলায় নদী-জলাশয়ে দূষণ ঠেকাতে কোন রাজ্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নিয়ে হলফনামা চায় শীর্ষ আদালত। গত ১৬ জানুয়ারি শুনানির সময় দেখা যায়, অনেক রাজ্যই হলফনামা জমা দেয়নি। প্রধান বিচারপতি রাজ্যগুলিকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেন।

প্রধান বিচারপতি খেহর, বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি সঞ্জয় কৃষ্ণ কউলের ডিভিশন বেঞ্চে নির্ধারিত গত ২০ ফেব্রুয়ারি শুনানি শুরু হলে দেখা যায়, সব রাজ্যই হলফনামা জমা দিয়েছে। বাদ শুধু পশ্চিমবঙ্গ। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী হলফনামা দাখিলের জন্য আরও দু'সপ্তাহ সময় চান। প্রধান বিচারপতি দু' দিনের মধ্যে হলফনামা-সহ রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের সচিবকে সশরীর আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেন। পরিবেশ সচিব অর্ণব রায় ২২ ফেব্রুয়ারি হলফনামা-সহ শীর্ষ আদালতে হাজির হলে রাজ্য সরকারের গড়িমসি মনোভাবের জন্য প্রধান বিচারপতি তীব্র সমালোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ হলফনামায় জানায়, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক হলদিয়া, হাওড়া ও আসানসোল—রাজ্যের এই তিন শহরকে আশঙ্কাজনক দূষিত এলাকা

বলে চিহ্নিত করেছে। প্রচণ্ড দূষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত দুর্গাপুর। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই সব এলাকায় দূষণ কমাতে ব্যবস্থা নিয়েছে। পরিবেশ বিধি না মানায় মহেশতলার ৭৯-টি ডাইং ও ব্লিচিং কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। ওই কারখানাগুলির বর্জ্য শোধনের জন্য একটি 'কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' তৈরি হচ্ছে। যেমন, রয়েছে বানতলা চর্ম নগরীতে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, যেখানে এমন ব্যবস্থা নেই, সেখানে তিন বছরের মধ্যে তা তৈরি করতে হবে। পুরসভা বা স্থানীয় প্রশাসনের হাতে অর্থ না থাকলে, কারখানাগুলি থেকেই তা আদায়ের জন্য ৩১ মার্চের মধ্যে একটি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যাতে আগামী অর্থবর্ষ থেকেই তা লাগু হয়। না হলে রাজ্য সরকার এই অর্থ বরাদ্দ করবে। ছয় মাসের মধ্যে সব রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে নিজেদের ওয়েবসাইটে নিয়মিত দূষণ মাত্রা জানানোর ব্যবস্থার সংস্থান করতে হবে। পর্ষদের সদস্য-সচিব ও পরিবেশ সচিব শীর্ষ আদালতের নির্দেশ রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবেন। তারা এই তথ্য পাঠাবেন কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল কর্তৃপক্ষকে। তারা এ বিষয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে রিপোর্ট পাঠাবেন।

- **অ্যান্টার্কটিকায় বরফের চাদরে ফাটলের দৈর্ঘ্য বেড়ে ১৬০ কিলোমিটার :**

সম্প্রতি ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিকা সার্ভের এক ভিডিও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞানী মহলে। অ্যান্টার্কটিকার লার্সেন-সি বরফের চাদরে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ ফাটলের নতুন ভিডিও। লার্সেন সি-র বড়োসড়ো চিড় নজরে আসে ২০১৬-র নভেম্বরে। সে সময় ফাটলের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১১০ কিলোমিটার (৬৮ মাইল)। দ্রুত বেড়ে সেই ফাটল এখন দাঁড়িয়েছে ১৬০ কিলোমিটারের (১০০ মাইল) কাছাকাছি। গভীরতা প্রায় ১৫০০ ফুট। নিউ ইয়র্কের ১০২-তলা বিশিষ্ট এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উচ্চতার সমান।

দক্ষিণ গোলার্ধে ১.৪০ কোটি বর্গকিলোমিটার জুড়ে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে পাহাড়, হিমবাহ, সমুদ্রের সঙ্গে প্রায় ৪৪-টি 'আইস শেল্ফ' বা বরফের চাদর রয়েছে। লার্সেন তার মধ্যে একটি। এই লার্সেন আইস শেল্ফ-কে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। লার্সেন-এ, লার্সেন-বি এবং লার্সেন-সি। এছাড়াও পরে লার্সেন ডি, ই, এফ এবং জি নামে এই বরফের চাদরগুলির নামকরণ করা হয়। লার্সেন-সি হল অ্যান্টার্কটিকার চতুর্থ বৃহত্তম বরফের চাদর। ৫ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃতি। ১৯৯৫ সালে লার্সেন-এ এবং ২০০২-তে লার্সেন বি—দুই বরফের স্তর উষ্ণায়ণের প্রভাবে পুরোপুরি গলে জল হয়ে যায়। এবার কি লার্সেন-সি-র পালা? প্রজেক্ট মিডাসের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, লার্সেন-সি-র ফাটলের জন্য ইতোমধ্যেই অ্যান্টার্কটিকার আবহাওয়ার বদল ঘটেছে। লার্সেন-বি গলে তৈরি হয়েছে অসংখ্য হিমশৈল। যখন কোনও একটি বরফের চাদরের স্তর গলতে থাকে পার্শ্ববর্তী স্তরগুলিতেও তার প্রভাব পড়ে। যেমনটি হয়েছে লার্সেন-সি-র ক্ষেত্রে। লার্সেন-বি-র মতো যদি লার্সেন-সি-র ভবিষ্যৎ হয়ে থাকে তাহলে অ্যান্টার্কটিকার গোটা বরফের চাদরের ১০ শতাংশ গলে জল হয়ে যাবে।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন

- **সার্ক সাহিত্য উৎসব :**

সম্প্রতি দিল্লিতে আয়োজিত হয় তিন দিনব্যাপী সার্ক সাহিত্য সম্মেলন "সাউথ এশিয়ান লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল"। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল "ফাউন্ডেশন অফ সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার" (ফসওয়াল)। দিল্লির অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ২৪ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি, এই চার দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল এই সাহিত্য উৎসব। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্ট মানুষজন। ভিসা সমস্যার কারণে আসেননি কেবল পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা।

ভাষার জন্য শহিদ হয়েছে শত শত প্রাণ—এই উদাহরণের জন্য বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ সারা বিশ্বে সমস্ত সাহিত্যপ্রেমী মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের যে মহান প্রাণদের রক্তে রেঙে উঠেছিল ঢাকার রাজপথ ও ১৯৬১-র ১৯ মে শিলচর স্টেশনে বাংলা ভাষা সরকারি ক্ষেত্র থেকে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে সামিল যে ১১ জন মানুষ পুলিশের গুলির সামনেও অবিচল থেকে মাতৃভাষার জন্য নিজেদের প্রাণ বলিদান দিয়েছিলেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় অধিবেশনের শুরুতে। ভাষা শহিদের স্মরণে এই নীরবতা পালনের প্রস্তাব দেন বাংলাদেশের তরুণ কবি আশরফ জুয়েল।

পাকিস্তান অংশগ্রহণ না করতে পারলেও এ বছর সার্ক সাহিত্য সম্মেলনে সংখ্যাধিক্য লক্ষ করার মতো। ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম সমেত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন তরুণ ও প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকরা। তাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ষাটের দশকের কবি-সাহিত্যিক তেমনই ২০০০-এর প্রথম দিকের নবীন কবি ও লেখকেরা। বাংলাদেশ থেকে কবি নরুল হুদা, আশরফ জুয়েল, জাব্বার আলনিয়াম-সহ মোট ২৬ জন আসেন। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল থেকে এক ঝাঁক নতুন কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল উৎসবে।

- **শাহাবুদ্দিন আহমেদের শিল্প প্রদর্শনী রাষ্ট্রপতি ভবনে :**

বিশ্বের প্রথম পঞ্চাশ জন 'মাস্টার পেইন্টার'-এর মধ্যে তিনি একজন। মেঘনা তীরের আলগি গ্রাম থেকে পৌঁছেছেন শিল্পের অন্যতম পীঠস্থান, প্যারিসে। তুলির সেই আঁচড়ে ভর করেই প্যারিস থেকে এবার ভারতে রাষ্ট্রপতি ভবনের চৌকাঠ। তিনি শাহাবুদ্দিন আহমেদ। এক সময়ে মুক্তি যোদ্ধা হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে। এবার প্রথম বিদেশি হিসাবে রাইসিনা হিলসে বিশেষ প্রদর্শনী করার অনন্য সম্মান পেলেন। বাঙ্ময় তুলির টানে, রঙে, সৃজনশীলতায় গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পাঁচটি দিন ভরে থাকল রাষ্ট্রপতি ভবনের আর্ট গ্যালারি।

বাংলাদেশের নরসিংহী জেলার রায়পুরা উপজেলার আলগি গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে শান্ত মেঘনা। বাড়িতে বিপ্লবী পরিবেশের অবহে বড়ো হয়ে ওঠা। এক দিকে শিল্পী মন, অন্য দিকে বাংলা মায়ের 'বন্দি' দশা। ছাত্র জীবন থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর

রহমানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে পড়েছিলেন ঢাকার রাস্তায়। স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকাও উড়িয়েছিলেন তিনিই। এর পর এক দিন নিজের নেশাকে ভালোবেসে শিল্পের পীঠস্থানে পাড়ি জমালেন। গত ৪২ বছর ধরে প্যারিসই তাঁর ঠিকানা। ২০০০ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'স্বাধীনতা পদক' পান। ফ্রান্স সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এক অন্য রকম সূর্যগ্রহণ দেখা গেল আফ্রিকার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ আর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে। পূর্ণগ্রাস বা খণ্ডগ্রাস নয়; এই সূর্যগ্রহণকে বলা হয় 'রিং অফ ফায়ার'। ২০১২-য় একই ধরনের সূর্যগ্রহণ হয়েছিল আমেরিকায়। 'রিং অফ ফায়ার' তখনই হয়, যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে থাকা চাঁদ এতটাই দূরে থাকে যে তা পুরোপুরি ঢেকে দিতে পারে না সূর্যকে। কিনারা থেকে উঁকি মারতে থাকে সূর্যের আলো। একেই বলে 'রিং অফ ফায়ার'। চিলি, আর্জেন্টিনা, অ্যাঙ্গোলা, জাম্বিয়া ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে সবচেয়ে ভাল ভাবে দেখতে পাওয়া গেছে এই 'রিং অফ ফায়ার' সূর্যগ্রহণকে।
- চাঁদের কক্ষপথে মানুষ পাঠাচ্ছে মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের সংস্থা 'স্পেস-এক্স'। ২০১৮ সালেই। 'স্পেস-এক্স'-এর 'ফ্যালকন-হেভি' রকেটে মহাকাশ যাত্রীদের জন্য আসন রয়েছে সাকুল্যে দু'টি। তার অ্যাডভান্সড বুকিংও হয়ে গিয়েছে। এলন মাস্ক গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের এ খবর জানান। তবে নাসা জানাচ্ছে, যে 'ফ্যালকন-হেভি' রকেটে চাপিয়ে দুই মহাকাশ যাত্রীকে বেসরকারি উদ্যোদে চাঁদের কক্ষপথে পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছে, তা মহাকাশে লম্বা পথ পাড়ি জমানোর উপযুক্ত কি না, এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। চাঁদের মুলুকে যাওয়া-আসার পথে 'ফ্যালকন-হেভি' রকেট পাড়ি দেবে ৩ থেকে ৪ লক্ষ মাইল। যাওয়া-আসা নিয়ে পার্থিব সময়ের নিরিখে ১৬৮ ঘন্টা। চাঁদের মাটিতে নামবেন না ওই দুই মহাকাশ যাত্রী; চাঁদের খুব লম্বা একটা কক্ষপথে ঘুরবে মহাকাশযান 'ফ্যালকন-হেভি'। '৭০-এ 'অ্যাপোলো-১৩'-এর মহাকাশচারীরা ওই কক্ষপথে থেকেই পাক মেরেছিলেন চাঁদকে।

● **ড্রোন মারতে ঈগল :**

প্রযুক্তিতে জঙ্গিরা এখন অনেক এগিয়ে। তাদের টেক্কা দিতে অভিনব পন্থা ফরাসি সেনাবাহিনীর। জঙ্গি ড্রোন দেখলেই এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে সোনালি ঈগলের দল। উড়ন্ত ড্রোনকে পায়ে খিমচে ধরে নিয়ে যাবে নিজের এলাকায়। সেভাবেই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেশ কয়েকবার সন্ত্রাসের কবলে পড়েছে ফ্রান্স। গত বছর গোড়ার দিকে ফরাসি প্রেসিডেন্টের রাজপ্রাসাদের উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে সন্দেহজনক ড্রোন। তাই এই ঈগলবাহিনী। বাহিনীর সদস্য এখন চারজন। দার্তানিয়, আথোস, পোর্থোস, আরামিস, এই হল চার সোনালি ঈগল। আলেকজান্দার দুমার 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'-এর তিন চরিত্রের (আথোস, পোর্থোস, আরামিস) নামে তিন ঈগলের নাম। চতুর্থ ঈগল দার্তানিয়, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স-এর মুখ্য চরিত্র। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে মঁ দ্য মারসঁ সেনা ঘাঁটিতে জোর কদমে চলেছে প্রশিক্ষণ। সেনা ঘাঁটির এক টাওয়ার থেকে উড়ে মাঠে নেমে ড্রোন লক্ষ্য করে এগিয়ে অক্লেশে পায়ে তুলে চলে যাচ্ছে দার্তানিয়। ড্রোনকে গুলি করেও নামানো যায় বটে; কিন্তু জনবহুল এলাকায় গুলি করে ড্রোন নামাতে গেলে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। তথ্য-প্রমাণ নষ্টের সম্ভাবনাও। ঈগলের থাবায় ড্রোন নামালে তা হওয়ার সুযোগ নেই। ফরাসি সেনা এখন ঈগল বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচ তৈরির তোড়জোড় করছে।

● **উড়ন্ত মোটর বাইক বানাতে চলেছে বিএমডব্লিউ :**

উবের নাসার প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এসে উড়ন্ত যান বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। গাড়ি প্রস্তুতকারক বিএমডডব্লিউ-ও বানাতে চলেছে উড়ন্ত দ্বিচক্রযান। ইতোমধ্যে ফ্লাইয়িং মোটর সাইকেলের একটি রেপ্লিকা তৈরি হয়ে গেছে বিএমডব্লিউ এবং লেগো নামে আর এক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে। নাম বিএমডব্লিউ আর ১২০০ জিএস অ্যাডভেঞ্চার বাইক। এই মোটর সাইকেলের ডিজাইন ভাবনায় সাহায্য করেছে বিখ্যাত টয় কোম্পানি দ্য লেগো। প্রায় ৬০৩-টি পার্টস দিয়ে তৈরি হয়েছে মোটর বাইক মডেলটি। এবার ওই মডেলের হুবহু রূপদান করবেন বিএমডব্লিউ-র ইঞ্জিনিয়ারিরা। চলতি বছরে জানুয়ারিতেই প্রকাশ্যে আসে মডেলটি। বিএমডব্লিউ মোটোরাডের সেলস এবং মার্কেটিংয়ের প্রধান হেনার ফস্ট জানিয়েছেন, বিএমডব্লিউ মোটোরাডের হাত ধরে খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে উড়ন্ত মোটরবাইক। তবে এই বাইক বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

● **ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বলতম পালসার :**

মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্র বা তারার দু'রকম অবস্থা হতে পারে। হয় ব্ল্যাক হোল-এ পরিণত হয়; নয় নিউট্রন স্টার বা নিউট্রন নক্ষত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় পালসার। যার চার পাশের চৌম্বক ক্ষেত্রটি অসম্ভব রকমের জোরালো। পালসার থেকে আলোর বিকিরণ বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে। ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বলতম পালসারের খোঁজ মিলল প্রথম পালসার আবিষ্কারের (১৯৬৭) ঠিক ৫০ বছরের মাথায়। নাম—'এনজিসি-৫৯০৭-ইউএলএক্স'। নাসার 'নিউস্টার' ('নিউক্লিয়ার স্পেকট্রোস্কোপিক টেলিস্কোপ অ্যারে') টেলিস্কোপে তা ধরা পড়েছে সম্প্রতি। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইএসএ বা 'এসা') 'এক্সএমএম-নিউটন' উপগ্রহেরও চোখে পড়েছে এই পালসার। রয়েছে পৃথিবী থেকে ৫০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। অর্থাৎ, মানুষের আদিপুরুষের জন্মের আগেই জন্ম হয় এই বিরল পালসার বা নিউট্রন স্টারটির।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সাড়া জাগানো গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'সায়েন্স'-এ। ওই আন্তর্জাতিক গবেষক দলে রয়েছেন এক বাঙালি সহযোগী গবেষকও। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অ্যাসোসিয়েট

প্রফেসর ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। 'এসা'-র উপগ্রহের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণের পর এ বিষয়ে আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স'-এ।

এই আবিষ্কার ব্রহ্মাণ্ডে উজ্জ্বলতম পালসারের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড। এর আগে ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বলতম পালসারটি ছিল 'এম-৮২-এক্স-২'। রয়েছে পৃথিবী থেকে এক কোটি ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বে। 'সিগার গ্যালাক্সি'-'মেসিয়ার-৮২'-তে। সদ্য আবিষ্কৃত পালসারটি তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি উজ্জ্বল। এমনকী, দশটা সূর্য শেষ হয়ে গিয়ে যে ব্ল্যাক হোল তৈরি করে, তার অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে যতটা আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসে, এই পালসারের ঔজ্জ্বল্যতা তার ১০ গুণেরও বেশি।

● **হারিয়ে যাওয়া চন্দ্রযানের খোঁজ ৮ বছর পর :**

দীর্ঘ দিন ধরেই নাসার লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এলআরও) আর চাঁদ মুলুকে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর পাঠানো প্রথম মহাকাশযান 'চন্দ্রযান-১'-এর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। চাঁদের পিঠ থেকে প্রতিফলিত হওয়া আলোর উজ্জ্বলতার জন্য কোনও অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদের কক্ষপথে ওই দুই মহাকাশযানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। নাসার তরফে পাসাডেনায় নাসার জেট প্রোপালসান ল্যাবরেটরির (জেপিএল) রাডার বিশেষজ্ঞ মারিনা ব্রোঝোভিক সম্প্রতি জানিয়েছেন, পৃথিবীতে বসানো টেলিস্কোপ দিয়েই 'এলআরও' এবং 'চন্দ্রযান-১'-কে চাঁদের কক্ষপথে খুঁজে পেয়েছে নাসা। 'এলআরও'-কে খুঁজে বের করাটা সহজতর ছিল। কারণ, সে কোন কক্ষপথে রয়েছে, সেটা জানা। শুধু কক্ষপথে তার সঠিক অবস্থান ঠাওর করা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে, ২০০৯-এর ৯ আগস্ট-এর পর ইসরোর 'চন্দ্রযান-১'-এর সঙ্গে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া 'চন্দ্রযান-১' আকারেও অনেক ছোটো। লম্বা, চওড়া, উচ্চতায় পাঁচ ফুট করে। পৃথিবী থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মাইল দূরে থাকা 'চন্দ্রযান-১'-কে ক্যালিফোর্নিয়ায় গোল্ডস্টোন ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন্স কমপ্লেক্সে বসানো ৭০ মিটার লম্বা একটা অ্যান্টেনা টেলিস্কোপ দিয়ে খুঁজে বের করা হয়েছে। যা একেবারেই নতুন প্রযুক্তি।

● **মোবাইলের গায়ে তিন নতুন জীবাণুর হদিশ :**

সারা দিন আমরা যে মোবাইল ঘাঁটছি অজান্তেই তা থেকে ছড়াচ্ছে জীবাণু। এমনই তিনটি নতুন জীবাণুর সন্ধান পেলেন পুণের এনসিসিএস (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেল সায়েন্স)-এর বিজ্ঞানীরা। কিন্তু তারা আদৌ ক্ষতিকারক নয় বলেই দাবি বিজ্ঞানীদের। ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার মলিকিউলার মাইক্রোবাইওলোজি এবং ইমিউনোলজি বিভাগের প্রফেসর উইলিয়াম দেপাওলো-র মতে, টয়লেট পেপারের থেকে অনেক বেশি জীবাণু থাকে মোবাইলের গায়ে। ২০১৫ সালে তার একটি গবেষণাপত্রে দেপাওলো জানান, টয়লেট পেপারে সাধারণত ৩ ধরনের ব্যাকটেরিয়া দেখা যায়। কিন্তু মোবাইলের গায়ে প্রায় দশ-বারো ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক মিলেছে। মোবাইলের গায়ে মিশে থাকা জীবাণুর মধ্যে নতুন দু'টি ব্যাকটেরিয়া এবং একটি ছত্রাককে সনাক্ত করতে পেরেছেন পুণের এনসিসিএস-এর বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানী জোগেস এস সাউচ এবং তার সাথীরা ২৭-টি মোবাইল থেকে জীবাণু সংগ্রহ করেন। মোবাইলগুলি থেকে ৫১৫-টি ব্যাকটেরিয়া এবং ২৮-টি ছত্রাকের সন্ধান পান তারা।

● **চন্দ্রযান-২ :**

ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযানের কাজ এগোচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত। আগামী বছরের মার্চ, এপ্রিলের মধ্যেই 'চন্দ্রযান-২' রওনা হতে পারে চাঁদের উদ্দেশ্যে। ওই অভিযানে চাঁদের কক্ষপথে ঘোরার জন্য থাকবে একটি অরবিটার মহাকাশযান। সঙ্গে চাঁদের মাটিতে নামার জন্য একটি 'ল্যান্ডার' ও চাঁদের মাটিতে নেমে ঘোরাফেরার জন্য একটি 'রোভার' মহাকাশযানও। 'জিএসএলভি-এমকে-টু' রকেটে চাপিয়ে 'চন্দ্রযান-২'-কে পাঠানো হবে চাঁদ-মুলুকে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চেয়ারম্যান এ. এস. কিরণকুমার গত পয়লা মার্চ এ কথা জানান।

ভেলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ইসরোর চেয়ারম্যান বলেন, 'চন্দ্রযান-২' যাতে নির্বিঘ্নে, নিরাপদে চাঁদে নামতে পারে, তার জন্য সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে একটি ইঞ্জিন বানিয়েছে ইসরো। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তিরুনেলভেলি জেলার মহেন্দ্রগিরি ও বেঙ্গালুরুর চিত্রদুর্গ জেলার চাল্লাকেরে ইসরোর দু'টি কেন্দ্রে। উপগ্রহটিরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে পুরোদমে।

● **ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা এড়াল মঙ্গলের চাঁদ 'ফোবস' ও নাসার মহাকাশযান 'মাভেন' :**

গত ৬ মার্চ, সবচেয়ে বড়ো মহাকাশ-দুর্ঘটনাটি ঘটতে চলেছিল। তার থেকে সামান্যের জন্য রেহাই পেল নাসার মহাকাশযান 'মাভেন' আর মঙ্গলের চাঁদ 'ফোবস'। মঙ্গলকে যথা রীতি নির্দিষ্ট কক্ষপথেই পাক মারছিল 'ফোবস'। তার আবর্তন গতিতেও ঘটেনি কোনও রদবদল। কিন্তু অঙ্কের হিসাবে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল নাসার মহাকাশযান 'মাভেন'-এর কম্পিউটার আর পাসাডেনায় নাসার জেট প্রোপালসান ল্যাবরেটরির (জেপিএল) গ্রাউন্ড কন্ট্রোল রুমের অভ্যন্তরীণ ও রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে। গত ৩ মার্চ পাসাডেনায় নাসার ওই কন্ট্রোল রুমের বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেন, ভয়ঙ্কর মহাকাশ-দুর্ঘটনার মুখে পড়তে চলেছে 'মাভেন' আর 'ফোবস'। একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা লাগতে চলেছে। তাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যেত ৬৭ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি খরচে বানানো নাসার মহাকাশযানটির। বিজ্ঞানীরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে মাভেন-এর গতিবেগ বাড়িয়ে দেন সেকেন্ডে প্রায় আধ মিটার। ফলে ৬ মার্চ মঙ্গলের চাঁদ 'ফোবস' থেকে নাসার মহাকাশযান 'মাভেন'-এর 'মহাকাশ দূরত্ব' দাঁড়ায় আড়াই মিনিট। গতিবেগ না বাড়ালে দু'টির মধ্যে দূরত্ব থাকতো সাকুল্যে সাত সেকেণ্ডের। ফলে 'ফোবস'-এর জোরালো অভিকর্ষ বল তার দিকে টেনে নিয়ে মাভেন-কে আছড়ে ফেলতে পারতো মঙ্গলের চাঁদের মাটিতে। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে অরবিটার, ল্যান্ডার ও রোভার মিলিয়ে নাসা, ইসরো ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইএসএ বা 'এসা') মোট ৬-টি মহাকাশযান রয়েছে মঙ্গলের এলাকায়।

● **কানাডায় হদিশ আদিমতম প্রাণের :**

পাওয়া গেল ৪২৮ কোটি বছর আগেকার অণুজীবের জীবাশ্ম। উত্তর-পূর্ব কানাডার নুভভুয়াগিত্তিক এলাকায়। পাথরের খাঁজে ওই অণুজীবের জীবাশ্মটিকে পাওয়া গিয়েছে স্ট্রয়ের মতো একটা টিউবের চেহারায়। বিজ্ঞানীদের দাবি, এটাই এখনও পর্যন্ত হদিশ মেলা পৃথিবীর আদিমতম অণুজীবের জীবাশ্ম। এর আগে আদিমতম অণুজীবের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়।

এই সাড়া জাগানো আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়। যদিও কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে, যে হিসেবে এই জীবাশ্মটিকে 'আদিমতম' অণুজীবের জীবাশ্ম বলা হয়েছে, তা নির্ভুল নাও হতে পারে। যে শিলাস্তরে ওই আদিমতম অণুজীবের জীবাশ্মের খোঁজ মিলেছে, তার বয়স নিয়েও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গবেষকরা জানিয়েছেন, যে শিলাস্তরে ওই আদিমতম অণুজীবের জীবাশ্ম মিলেছে, সেখানে এমন কিছু রাসায়নিক যৌগ পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করে ওই এলাকায় জৈবিক প্রক্রিয়া চলেছিল। যার পরিণতি ওই প্রাণ।

মূল গবেষক ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের বায়োজিওকেমিস্ট ডড ম্যাথুর অভিমত, পৃথিবীর জন্মের (৪৬০ কোটি বছর) অল্প কিছু পরেই অণুজীবের জন্ম হয়েছিল এই বাসযোগ্য গ্রহে। যে জায়গায় জীবাশ্মটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই হাডসন উপসাগরের গোটা পূর্ব উপকূলটাই লোহা আর লোহার নানা রকমের অক্সাইড যৌগে ভরা। সুদূর অতীতে জায়গাটা ছিল সমুদ্র গর্ভে। পরে কোনও ছিদ্রপথে নিচের অত্যন্ত গরম জলের স্রোত ওপরে উঠে আসে। আর সেই 'পথে'-ই হয়তো ওপরে উঠে এসে শিলা স্তরের খাঁজে আটকে গিয়েছিল ওই আদিম অণুজীবের জীবাশ্ম।

● **পাওয়া গেল প্রথম 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ পালসার' :**

পালসার আবিষ্কারের ৫০ বছরের মাথায় ঘটল আরও এক বিরলতম ঘটনা। চলতি বছরের গোড়ায় হদিশ মিলল ব্রহ্মাণ্ডে প্রথম কোনও 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ পালসার'-এর। নাম—'এআর-স্করপি'। রয়েছে পৃথিবী থেকে ৩৮০ আলোকবর্ষ দূরে। 'স্করপিয়াস' নক্ষত্রপুঞ্জ। যে সাদা বামন নক্ষত্রটি থেকে এই পালসারটির জন্ম, তার আকার পৃথিবীর মতো হলেও ভর এই গ্রহের প্রায় ২ লক্ষ গুণ বেশি। সাড়ে তিন ঘণ্টায় ওই পালসারটি পাক মারছে তার ঠাণ্ডা নক্ষত্রটিকে। সাউথ আফ্রিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজার্ভেটরির জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডেভিড বাকলে ও ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল পালসারটি আবিষ্কার করেছেন। তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার-অ্যাস্ট্রোনমি' জার্নালে। এ এক অভিনব আবিষ্কার। কারণ, ১৯৬৭ সালে প্রথম পালসার আবিষ্কারের পর থেকেই তত্ত্বগতভাবে এমন পালসারের অস্তিত্বের ধারণা ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। কিন্তু খোঁজ মিলছিল না। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘোরে যে 'ক্র্যাব পালসার' (এক সেকেন্ডে ৩০ বার), তার সন্ধান পাওয়ার পর মনে হয়েছিল, 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ পালসার' বোধহয় কল্পনাই। কারণ, 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ পালসার' অত জোরে ঘুরতে পারে না।

● **ল্যাবরেটরি থেকে উধাও বহু পরিশ্রমে তৈরি ধাতব হাইড্রোজেন :**

প্রায় ৮০ বছর ধরে ধাতব হাইড্রোজেন বানানোর চেষ্টা চালিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ, বিদ্যুৎ-সহ শক্তি পরিবহণে অসম্ভব রকমের দ্রুত ও দক্ষ হয় ধাতব হাইড্রোজেন। অত্যন্ত উচ্চ চাপ আর কম তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনকে এই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে গত জানুয়ারিতেই ঘোষণা করেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। আগামী দিনে পদার্থটি দিয়ে রকেটের বিকল্প জ্বালানি বা খুব ভাল বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বানানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন। যদিও আবিষ্কারটি নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল সমালোচনাও। তার জেরে কিছু দিন সদ্য আবিষ্কৃত ধাতব হাইড্রোজেনের 'স্যাম্পল'-টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ রেখেছিলেন গবেষকরা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তোড়জোড় শুরু হলে দেখা যায়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের যে-জায়গায় ওই ধাতব হাইড্রোজেনের 'স্যাম্পল'-টি রাখা ছিল, তা উধাও হয়ে গিয়েছে। মূল গবেষক আইজ্যাক সিলভেরার বক্তব্য হয় পদার্থটি ঘরের স্বাভাবিক চাপে হারিয়ে গিয়েছে বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তা গ্যাসীয় অবস্থায় পৌঁছে উবে গিয়েছে। পদার্থটি মাথার চুলের থেকেও সরু। ০.০০১৫ মিলিমিটার পুরু আর ব্যাস ০.০১ মিলিমিটার। যে চাপে ওই ধাতব হাইড্রোজেন বানানো হয়েছিল, সেই চাপে হীরক খণ্ডও ভেঙে টুকরো করা যায়।

● **সৌরযাত্রার পথে নাসার মহাকাশযান :**

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ২০১৮ সালেই সূর্যের কাছে এক রোবটিক মহাকাশযান পাঠাতে চলেছে। পরিকল্পনা সফল হয়, এই প্রথম সূর্যের এত কাছে মানুষের তৈরি কোনও জিনিস পৌঁছবে। এমনকী সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ, বুধকেও পেরিয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল (১৪ কোটি ৯০ লক্ষ কিলোমিটার)। সূর্যের প্রায় ৪০ লক্ষ মাইল (৬০ লক্ষ কিলোমিটার) দূর থেকে নাসার তৈরি সোলার প্রোব প্লাস নামে ওই রোবটিক মহাকাশযানটি প্রদক্ষিণ করবে। প্রশ্ন জাগছে, সূর্যের এত কাছে গেলে ঝলসে যাবে না তো মহাকাশযানটি? নাসার দাবি, প্রায় ১৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে সোলার প্রোব প্লাসের। আগামী বছরে জুলাই-আগস্ট নাগাদ এই মহাকাশযান পাঠানো হবে। প্রায় ৬ বছর ১১ মাস ধরে সেটি সূর্যের চার দিকে প্রদক্ষিণ করে নানা তথ্য পাঠাবে। নাসার দাবি, মহাকাশের আবহাওয়া বুঝতে সাহায্য করবে এই যান। এখন সৌরঝড়ের কারণে মহাকাশ থেকে তথ্য পাঠানোর কাজ মাঝে মাঝেই ব্যাহত হয়। ক্ষতি হয় কোটি কোটি ডলার। সোলার প্রোব প্লাস সৌরঝড়ের পূর্বাভাস দেবে। এছাড়াও সৌরঝড় কিভাবে তৈরি হয় এবং ঝঞ্ঝার আগাম বিপদ বুঝতে সাহায্য করবে। সূর্যের উপরিতলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠাবে এই যান।

● **নানা প্রজাতির ডিম পাড়বে একই মুরগি :**

নানা প্রজাতির ডিম একাই পাড়বে, নিজেদের গবেষণাগারে জেনেটিক্যালি মডিফ্যায়েড এমনই এক সংকর প্রজাতির মুরগির জন্ম

দিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটসের আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভ্যান্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর এক সম্মেলনে এই অভিনব বিষয়টি তুলে ধরেন তারা। এই মুরগি বার্ড ফ্লু-র মতো রোগও অনায়াসেই প্রতিরোধ করতে পারবে। অর্থাৎ, এর ডিম থেকে জন্ম নেওয়া কোনও মুরগি বার্ড ফ্লু-য়ের বাহক হবে না। পাখিদের প্রজননে মুখ্য ভূমিকা নেয় ডিডিএক্স৪ (DDX4) নামক জিন। জিন এডিটিং পদ্ধতিতে মডিফাই করা হয়েছে এই জিনটিই। তবে নিজের ডিম পাড়তে পারবে না এই মুরগি। সরোগেট মাদারের ভূমিকা পালন করবে। অন্য কোনও প্রজাতির মুরগির স্টেম সেল এনে হাইব্রিড মুরগির গর্ভে স্থাপন করলে সেই প্রজাতির ডিম নিজের দেহে তৈরি করে এই প্রজাতির ডিম পাড়বে। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণ করতে এই মুরগি সাহায্য করবে বলে দাবি বিজ্ঞানীদের। ইতোমধ্যেই 'রাম্পেলস গেম', 'স্কটস ডাম্পি', 'সিসিলিয়ান বাটারকাপ', 'ওল্ড ইংলিশ ফেজ্যান্ট ফাউল' প্রভৃতি বিরল প্রজাতির ডিম পেড়েছে এই মুরগি।

● **স্তন ক্যান্সার গবেষণায় নজরকাড়া আবিষ্কার :**

স্তন ক্যানসারের বাড়-বৃদ্ধিতে যে শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থার কোষ, কলাগুলিই সাহায্য করে তা বিজ্ঞানীরা জানতেন। কিন্তু, কিভাবে তারা টিউমারকে বাড়তে, ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে, তা বোঝা যাচ্ছিল না। একে শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থার দ্বিচারিতা বলা যায়। এই 'দ্বিচারিতা'-ই ক্যান্সার চিকিৎসায় আগামীদিনে জোরালো হাতিয়ার হতে চলেছে। যা তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে (আলটিমেট স্টেজেস) পৌঁছে যাওয়া স্তন ক্যান্সারও সারিয়ে ফেলতে পারে। যা একাধারে হবে কেমোথেরাপি আবার ইমিউনোথেরাপিও। নজরকাড়া এই আবিষ্কারটি করেছেন আমস্টারডামের 'নেদারল্যান্ড ক্যান্সার ইনস্টিটিউট'-এর সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট কেলি কার্স্টেন। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়।

মহিলারা মোটামুটি ৯ ধরনের ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হন। শীর্ষে স্তন ক্যান্সার। অন্যান্য ক্যান্সারে মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার হার ১.৫ শতাংশ থেকে ৬.১ শতাংশ। সেখানে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হার গড়ে ৩০.৮ শতাংশ। মানে, ৫ গুণেরও বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ('হু') পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, সবক'টি মহাদেশে মহিলাদের মৃত্যুর কারণ যেসব রোগ, তালিকায় প্রথম তিনটি প্রাণঘাতি অসুখের একটি—স্তন ক্যান্সার। ক্যান্সারের টার্গেটেড থেরাপি (ওষুধ) ও কেমোথেরাপির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও।

যে ইঁদুরগুলি ওই ক্যান্সারের তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, তাদের ওপরে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন কার্স্টেন ও তার সহযোগীরা। মানুষের ক্ষেত্রে যাকে বলে, 'মেটাস্টাসাইজিংব্রেস্ট'। গবেষকরা দেখেন, টিউমার হওয়ার পরেই তা শরীরে এক রকমের সংক্রমণের জন্ম দেয়, যা খুব দ্রুত হারে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে মেটাস্টাসিকের গতি অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। আর এখানেই অণুঘটকের ভূমিকা নেয় শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থার কোষ-কলাগুলি। নাম—নিউট্রোফিল। প্রাথমিকভাবে টিউমার হওয়ার পর যে সংক্রমণ হয় শরীরে, সেই সংক্রমণই জন্ম দেয় নিউট্রোফিলের। দেহের প্রতিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে যে টি-সেলগুলি থাকে, সেগুলি ক্যান্সার রুখতে (এমনকী, স্তন ক্যান্সারও) বড়ো ভূমিকা নেয়। তাই নিউট্রোফিলের মূল টার্গেট এই টি-সেলগুলি। টি-সেলগুলিকে অকেজো বানিয়ে দেয় নিউট্রোফিলগুলি। ফলে, টিউমার আয়তন আর সংখ্যায় বাড়তে পারে খুব দ্রুত হারে। নিউট্রোফিলগুলিকে দিয়ে এই কাজ করায় দেহের প্রতিরোধী ব্যবস্থার 'ডোমিনো এফেক্ট'। সেই 'ডোমিনো এফেক্ট'-এর যাবতীয় ধাপগুলির হদিশ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা এবার। আর তার মাধ্যমে টিউমার নিকেশ করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। ফুসফুস ও চামড়ার ক্যান্সারের ক্ষেত্রে। তবে স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তা এখনও চালু হয়নি। ইঁদুরের ওপর ওই ইমিউনোথেরাপির সঙ্গে কেমোথেরাপিকে মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন বিজ্ঞানীরা, তা স্তন ক্যান্সারে লাগাম পরাতে পারছে। একে বলা হচ্ছে, কেমো-ইমিউনোথেরাপি। ক্লিনিক্যাল টেস্ট বা মানুষের ওপর পরীক্ষার কাজটা শুরু হয়েছে নেদারল্যান্ডস ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে। ইঙ্গিত মিলেছে মানুষের ওপরেও সফল হওয়ার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ।

প্রয়াণ

● **কেনেথ অ্যারো :**

১৯৭২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন মাত্র ৫১ বছর বয়সে, জন হিকস-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে। আমৃত্যু অর্থনীতিতে সবচেয়ে কম বয়সি নোবেল জয়ীর শিরোপা থাকল তাঁরই। ২১ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আল্টো-য় ৯৫ বছর বয়সে মারা গেলেন কেনেথ অ্যারো। বহু অর্থনীতিবিদের মতে, বিশ শতকে অর্থনীতির দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী তাত্ত্বিক। অমর্ত্য সেন থেকে জোসেফ স্টিগলিটজ. অনেকেই তাঁর কাজে প্রভাবিত।

তাঁর নামের সঙ্গে যে তত্ত্বের যোগ অবিচ্ছেদ্য, সেটি হল 'ইম্পসিবিলিটি থিয়োরেম'। যে কোনও প্রশ্নই প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ বা বাছাই আছে। সেগুলির থেকে যদি একটি সন্তোষজনক সামাজিক বাছাই বা চয়নে পৌঁছতে হয়, তবে তার জন্য কয়েকটি ন্যূনতম শর্ত পালন করতে হবে। অ্যারো দেখিয়েছেন, সেই শর্তগুলির সব ক'টা পূরণ করা সম্ভব নয়। এই তত্ত্ব সামাজিক চয়নের সমগ্র ধারণাটাকেই বদলে দিয়েছে বললে বেশি বলা হবে না।

কোনও একটি আদর্শ অবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়া আসলে কতখানি সহজ এবং সেই আদর্শে অটল থাকতে গেলে কতটা সাবধানী হতে হবে, তা দেখিয়ে দেওয়াই বোধ হয় ছিল অ্যারোর অর্থনৈতিক দর্শন। যে 'জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম' মডেল নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকার জন্য তাঁর নোবেল জয়, সেটি অর্থনীতির তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ। অ্যাডাম স্মিথ যে বাজারের 'অদৃশ্য হাত'-এর কথা বলেছিলেন, এই মডেল তারই বিশদ গাণিতিক রূপ। কিন্তু, অ্যারো সারা জীবন ধরে দেখিয়ে গিয়েছেন, বাজারের অদৃশ্য হাতের কল্যাণে অর্থনীতি শ্রেষ্ঠ অবস্থায় থাকবে—এমনটা হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো পূরণ করতে হয়, তা কতখানি অবাস্তব। বাজার ব্যবস্থার ফাঁকগুলোকে

দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তার থেকে নিস্তারের পথও বাতলে দিয়েছেন। বিশ শতকের খুব কম অর্থনীতিবিদের কাজই সাধারণ মানুষের জীবনে এত প্রভাব ফেলেছে।

● **কালিকাপ্রসাদ :**

গত ৭ মার্চ পথ দুর্ঘটনায় গানের দল 'দোহার'-এর কালিকাপ্রসাদ মারা যান। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ওই দুর্ঘটনায় 'দোহার'-এর বাকি সদস্য নীলাদ্রি রায়, অর্ণব রায়, সন্দীপন পাল, সুদীপ্ত চক্রবর্তী ও রাজীব দাস গুরুতর জখম হন। বিশিষ্ট এই শিল্পীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসমের শিলচরে কালিকাপ্রসাদের জন্ম ১৯৭০-এ। সেখানেই স্কুল-কলেজের পাঠ সেরে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। ১৯৯৯-তে গানের দল দোহার গড়ে তোলেন। লোকগানই গাইতেন কালিকাপ্রসাদ।

● **অশ্বিন সুন্দর :**

গত ১৭ মার্চ ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ভারতের অন্যতম রেসিং চ্যাম্পিয়ন অশ্বিন সুন্দর ও তার স্ত্রী নিবেদিতার। চেন্নাইয়ের পট্টিনাক্কম এলাকার কাছে সন্তোম হাই রোডের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার সময় বছর সাতাশের অশ্বিন নিজেই তার বিএমডব্লিউ গাড়িটি চালাচ্ছিলেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেসার ছিলেন অশ্বিন। ২০১৩ ও '১৪ সালে জাতীয় স্তরে ফর্মূলা ৪ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন তিনি। আন্তর্জাতিক স্তরে এমআরএফ ফর্মূলা ১৬০০-র শিরোপাও পেয়েছিলেন। স্ত্রী নিবেদিতা ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। অশ্বিনের মৃত্যুতে ট্যুইট করে দুঃখপ্রকাশ করেছেন রেসার করুণ চন্দক-সহ আরও অনেকেই।

বিবিধ

● **আয়ার্ল্যান্ড সদ্যজাতদের গণকবর :**

গণকবারের ধুলো সরিয়ে বেরিয়ে এল আয়ার্ল্যান্ডের এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়। অবিবাহিত মায়েদের সন্তানদের অগণিত কঙ্কাল মিলল দেশের ছোট্ট শহর টুয়ামের এক গণকবরে। ২০১৪-তেই এ খবর জানিয়েছিলেন স্থানীয় গবেষক ক্যাথরিন করলেস। তার কথায় সে সময় আমল দেয়নি আয়ার্ল্যান্ড সরকার। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার চাপে পড়ে সম্প্রতি নড়েচড়ে বসে তারা। একটি কমিশন গঠন করে গণকবরের খনন কাজ শুরু করা হয়। গত ৩ মার্চ কমিশন সেই কলঙ্কিত অধ্যায়ের রিপোর্ট পেশ করেছে। জানিয়েছে, পশ্চিম আয়ার্ল্যান্ডের গ্যালওয়ে কাউন্টির টুয়ামের প্রসূতি ভবনের বিল্ডিংয়ের নিচে সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে রয়েছে ১৭-টি কুঠুরি। তাতেই মিলেছে অসংখ্য শিশুর কঙ্কাল।

নিজের গবেষণাপত্রে ক্যাথরিন দাবি করেছিলেন, অবিবাহিত অন্তঃসত্বারা থাকতে আসতেন সেখানে। প্রসবের কিছু দিন পর সেখান থেকে চলে গেলেও প্রায় কেউই সদ্যোজাত সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। প্রসূতি ভবনের নিচেই এইসব সদ্যজাতকে গণকবর দেওয়া হ'ত। ওই গণকবরে অন্তত ৭০০ থেকে ৮০০ শিশুর কঙ্কাল রয়েছে। ক্যাথরিনের গবেষণার কথা নিজের ব্লগে উল্লেখ করেন ওয়াশিংটন পোস্টের ব্লগার টেরেন্স ম্যাকয়। এই ঘটনায় সাড়া পড়ে দেশ-বিদেশে। বন সেকুর সিস্টার্স নামে এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যেই চলত ওই প্রসূতি ভবন। গণকবরে ১৯২৫ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সময়কালের কঙ্কাল মিলেছে। কমিশন জানিয়েছে, ওই গণকবরে খনন কাজের পর কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঙ্কালগুলির পরীক্ষা করা হয়েছে। জানা গেছে ওই কঙ্কালগুলির বয়স ৩৫ সপ্তাহ থেকে ৩ বছরের মধ্যে। টুটাম শহরের ওই প্রসূতি ভবন বন্ধ হয়ে যায় ১৯৬১-তে। রেডিও কার্বন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইঙ্গিত মিলেছে, প্রসূতি ভবনের কার্যকালের মধ্যেই ওই শিশুদের গণকবর দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত কমিশন সদস্যরা এ নিয়ে আরও তদন্ত করার কথা জানিয়েছেন। ঘটনায় অস্বস্তিতে আয়ার্ল্যান্ড সরকার। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর এ বিষয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বন সেকুর সিস্টার্স কর্তৃপক্ষ। জানিয়েছে, তদন্তের কাজে সাহায্যের জন্য ওই সময়কালের সমস্ত নথিপত্র কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

● **৬৯তম সন্তানের জন্ম দিয়ে মারা গেলেন বিশ্বের উর্বরতম মহিলা :**

নিজের বয়স ৪০। জন্ম দিয়েছিলেন ৬৮-টি সন্তানের। কিন্তু আর দিল না শরীর। ৬৯তম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলেন গাজার এই মহিলা।

রিপোর্ট অনুযায়ী, জীবনে কোনও দিন কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করেননি তিনি। ১৬ বার যমজ, সাত বার ট্রিপলেটস (তিনটি সন্তান এক সঙ্গে) এবং চার বার কোয়াড্রপলেটস (চারটি সন্তান এক সঙ্গে) সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। মহিলার স্বামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে তার মৃত্যুর খবর দেন। ইতিহাস ও সমীক্ষা বলছে, তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর মহিলা। তার আগে ৬৯-টি সন্তানের জন্ম দেওয়ার রেকর্ড ছিল ভাসিয়ালেভা নামের এক রাশিয়ান মহিলার। মৃত্যুর আগে সেই রেকর্ড ছুঁয়ে গেলেন প্যালেস্তিনীয় এই মহিলা।

● **তিন সপ্তাহে ১০৮ কেজি কমিয়ে ২৫ বছর পর উঠে বসছেন ইমান :**

বিশ্বের সবচেয়ে মোটা মহিলা ইমান আহমেদ। ৫০০ কেজি ওজনের ইমান মিশরের কায়রোর বাসিন্দা। গত ২৫ বছর ধরে শুধু ঘরবন্দি নয়, কার্যত বিছানাবন্দি ছিলেন ৩৭ বছরের ইমান। নিজে হাতে কিছুই করতে পারতেন না। অত্যধিক ওজনের কারণে হাত তোলা, বিছানায় উঠে বসা সব কিছুতেই অক্ষম ছিলেন। সে দেশে চিকিৎসায় সেভাবে সাড়া না মেলায়, শেষমেশ তাকে নিয়ে আসা হয় মুম্বইতে। আর হাতেই মিলেছে সুফল। তিন সপ্তাহে ১০৮ কেডি ওজন ঝরল ইমানের।

২৫ বছর পর প্রথম বারের জন্য নিজে থেকে উঠে বসতেও পারছেন তিনি। চিকিৎসকরা তাকে নিজের পায়ে উঠে দাঁড় করানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। মুম্বইয়ের সইফি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইমান আহমেদকে কড়া ডায়েটের অনুশাসনে রাখা হয়েছে। সঙ্গে রোজ ৯০ মিনিটের ফিজিওথেরাপি সেশন। ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার পথে তিনি। মুম্বইয়ের ডাক্তারদের টার্গেট, এক বছরে ইমানের ওজন ২০০ কেজিতে নামিয়ে আনা। যার জন্য ঝরাতে হবে মোট ৩০০ কেজি।

● **আজও ব্রিটিশ সংস্থার অধীনে ভারতের এই রেললাইন :**

শকুন্তলা রেলওয়েজ। দেশের একমাত্র রেল যা ভারতের মধ্যে থেকেও ভারতের নয়। মহারাষ্ট্রের মূর্তাজাপুর থেকে যাবতমাল এবং মুর্তাজাপুর থেকে অচলপুর মোট ১৮৯ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে রয়েছে শকুন্তলা রেলওয়েজ। কখনও পূর্ণা নদী, কখনও চন্দ্রভাগা নদীকে পাশ কাটিয়ে গড়ে ২০ কিলোমিটার গতিবেগে 'ছুটে' চলে অমরাবতী জেলার 'লাইফ লাইন' শকুন্তলা।

কিলিক-নিক্সন অ্যান্ড কোম্পানি ১৯০৩ সালে এই রেলপথ তৈরি করে। ১৯১০ সালে প্রথমে গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানি (জিআইপিআরসি), পরে ১৯১৩ সালে জিআইপিআরসি-এর শাখা সেন্ট্রাল প্রভিন্স রেলওয়ে কোম্পানি (সিপিআরসি)-র হাতে তা হস্তান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে সমস্ত বেসরকারি রেল কোম্পানিই ভারতীয় রেলের আওতায় চলে আসে। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র শকুন্তলা রেল। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আজও এই রেল রয়েছে বেসরকারি মালিকানাতেই। ভারতের মধ্যে হয়েও ভারতীয় রেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আজও এটি সিপিআরসি-র অধীনে। যা আবার ব্রিটিশ কোম্পানি কিলিক-নিক্সনের হাতে।

শকুন্তলা রেল গিয়ে মিশেছে মুম্বাই-নাগপুর-কলকাতা ব্রড গেজ লাইনের সঙ্গে। সেই সময় মুম্বই বন্দর থেকে ম্যানচেস্টারের কাপড় শিল্পের জন্য পাঠানো হ'ত প্রচুর পরিমাণ তুলো। অমরাবতী জেলা থেকে তুলো নিয়ে যাওয়ার কাজেই প্রধানত ব্যবহৃত হ'ত এই রেল লাইন। ১৯২১ সালে ম্যানচেস্টারে তৈরি একটি জেডডি স্টিম ইঞ্জিন চলত এই লাইনে। ৭০ বছর পর ১৯৯৪-এর ১৫ এপ্রিল পুরোনো ইঞ্জিনের বদলে একটি ডিজেল ইঞ্জিন আনা হয় এই রেলের জন্য। বর্তমানে মধ্য রেলের ভুসওয়াল ডিভিশনের মধ্যে রয়েছে এই শকুন্তলা রেল। কিন্তু মুর্তাজাপুর থেকে যাবতমাল (১১৩ কিলোমিটার) এবং মুর্তাজাপুর থেকে অচলপুর (৭৬ কিলোমিটার) শকুন্তলা রেলের এই মোট ১৮৯ কিলোমিটার পথ আজও রয়েছে সিপিআরসি-র আওতায়।

● **জেন অস্টিনের মৃত্যু রহস্য :**

শেষ জীবনে প্রায় অন্ধ হতে বসেছিলেন ঔপন্যাসিক জেন অস্টিন। সম্ভবত আর্সেনিকের প্রভাবে। সম্প্রতি অস্টিনের ব্যবহৃত তিন জোড়া চশমা পরীক্ষা করে দেখে ব্রিটিশ লাইব্রেরি। তাতেই এই তথ্য উঠে এসেছে। ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ারে থাকতেন উনিশ শতকের এই অন্যতম শক্তিশালী লেখিকা। তার 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' 'সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি', 'ম্যানসফিল্ড পার্ক' উপন্যাসগুলো বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। ১৮১৭-র ১৮ জুলাই মাত্র ৪১ বছর বয়সে মৃত্যু হয় জেনের। কেন এত কম বয়সে, তা নিয়ে অনেক আলোচনা-বিশ্লেষণ হয়েছে। অনেকে বলেছেন, মৃত্যুর কারণ যক্ষ্মা। অনেকে আবার বলেন, ক্যানসার হয়েছিল লেখিকার। ব্রিটিশ লাইব্রেরির গবেষকদের অনুমান, আর্সেনিকের বিষক্রিয়াতেই হয়তো এত কম বয়সে থেমে গিয়েছিল জেনের কলম। সম্ভবত সে সময় বাতের ব্যাথায় ভুগতেন তিনি। আর তার জন্যই নিয়মিত ব্যথার ওষুধ খেতে হ'ত। গবেষণা বলছে, সে সময় বাতের ব্যথার ওষুধে আর্সেনিকের মতো ভারী ধাতু ব্যবহার হ'ত। এভাবেই জেনের শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল আর্সেনিক-বিষ।

জেনের তিন জোড়া চশমা পাওয়া গিয়েছে। দেখা গিয়েছে, তার 'পাওয়ার' ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। প্রথম কাচ জোড়ার পাওয়ার ছিল +১.৭৫, দ্বিতীয়টির +৩.২৫ এবং সর্বশেষ ব্যবহার করা কাচের পাওয়ার +৫.০। আর্সেনিকের বিষক্রিয়াতেই এমনটা হওয়া সম্ভব বলে অনুমান গবেষক-চিকিৎসকদের।

● **বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর শহর ভিয়েনা :**

সৌন্দর্যই শেষ কথা নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা কতটা এগিয়ে? জীবনযাত্রার মান কেমন? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতায় কতখানি সচেতন তারা? এসব কিছু মাথায় রেখেই প্রতি বছর বাছা হয় বিশ্বের সুন্দরতম শহরকে। ইকনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট গ্লোবাল 'লাইভ এবিলিটি' স্টাডিতে এবার ২৩১-টি শহরের উপর সমীক্ষা করা হয়। দেখা গিয়েছে দানিউব নদীর তীরে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাই এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বাসযোগ্য শহর। অবাক করার বিষয় হল লন্ডন, প্যারিস, টোকিও এবং নিউ ইয়র্কের মতো বিত্তশালী শহর জায়গাই পায়নি তালিকার প্রথম ২৫-এ। আর বিশ্বের ভয়ঙ্করতম শহরের তকমা পেয়েছে বাগদাদ।

● **ইউনিসেফ-এর রিপোর্ট, সিরিয়ায় শিশুদের জন্য ভয়াবহ ২০১৬ :**

গত দু' বছর ধরে টানা যুদ্ধে সিরিয়া এখন প্রায় শ্মশান। তবে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সিরিয়ার শৈশব। আর তার হিসেবে ২০১৬ সালটা ভয়াবহ, গত ১৩ মার্চ একটি রিপোর্টে জানায় ইউনিসেফ। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ মাসে অন্তত ৬৫২-টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে সিরিয়ায়। যা ২০১৫ সালের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। এই মুহূর্তে সিরিয়ায় একটি স্কুলও অক্ষত নেই। গত এক বছরে অন্তত ৮৫০ শিশুকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছে। যে সংখ্যাটা আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। কোথাও বা সশস্ত্র সেনার মুখে গুলি খেতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাদের। আত্মঘাতী জঙ্গি, পারতপক্ষে জেলখানার নিরাপত্তা রক্ষক—সিরিয়ার শিশুদের সামনে ভবিষ্যৎ বলতে এখন এই কয়েকটা রাস্তাই খোলা। ভরসা বলতে মানবাধিকার সহায়তা। রিপোর্ট অনুসারে, এই মুহূর্তে অন্তত ৬০ লক্ষ শিশু নির্ভর করছে মানবাধিকার সহায়তার উপর। কিন্তু তার বাইরেও বিভিন্ন এলাকার প্রায় আড়াই লক্ষ শিশু খাবার, জল, চিকিৎসার অভাবে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে।

ব্রিটিশ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানায়, সিরিয়ার অধিকাংশ শিশুই এখন 'টক্সিক স্ট্রেস' নামে এক মানসিক রোগের শিকার। ছ' বছরের নিচে বয়স, এমন অন্তত ৩০ লক্ষ সিরীয় শিশু জন্মের পর থেকে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, জানেও না। ২০১১ থেকে গৃহযুদ্ধে অন্তত ৪০ লক্ষ সিরিয়াবাসীর মৃত্যু হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের দাবি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এত বড়ো মানবিক সঙ্কটের মুখে বিশ্বকে কখনও পড়তে হয়নি।❑

সংকলক : রমা মন্ডল

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

WBCS-2015 এর গ্রুপ A এবং B এর চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হল ৫ই অক্টোবর, ২০১৬

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

এবারও সাফল্যে No.1

1st Executive WBCS-2015

SOUVIK GHOSH

1st CTO WBCS-2015

MOUMITA SENGUPTA

1st Executive
WBCS - 2015

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ।

সৌভিক ঘোষ, Executive (Rank-1), WBCS - 2015

WBCS-2015 : A এবং B গ্রুপে মোট সফল ৩০ জনেরও অধিক

EXE SUPRATEEM ACHARYA

EXE BIJOY GIRI

EXE SAUGATA CHOWDHURY

EXE MIHIR KARMAKAR

EXE ARGHYA GHOSH

EXE BISWAJIT DAS

EXE MD MOSARRAF HOSSAIN

EXE HUMAYUN CHOWDHURY

EXE SM ERFAN HABIB

EXE SARWAR ALI

EXE RAMJIBAN HANSDA

EXE RATHIN BISWAS

EXE TIRTHANKAR GHOSH

DSP MD ALI RAZA

CTO SOMESWAR PATRA

CTO DHRUBA JYOTI MAJUMDER

CTO JUNAID AMIR

CTO BHANU KEORAH

CTO ALOKE KUMAR BAR

EXCISE HABIBUR RAHAMAN

CO-OP. SERVICE ABHISHEK BASU

CO-OP. SERVICE NIKHAT PARWEZ

CO-OP. SERVICE BASUDEB SARKAR

ADSR MD JAWED

ADSR AYAN KUMAR SINHA

ADSR ARMAN ALAM

To crack WBCS the most important thing is to know about the trend and changing pattern of exam. I am very thankful to Academic Association for guiding me to overcome the fear regarding the interview.

Md. Jawed, ADSR (Rank-2), WBCS-2015

Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

Moumita Sengupta, CTO (Rank-1), WBCS - 2015

ডব্লুবিসিএস - পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে খুব বেশী জটিল নয় সেটা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন -এ আসার আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়ে আমার দূর্বলতা গুলোকে বুঝতে পেরে সমাধানে সচেষ্ট হই । আমার জীবনের এত বড় পরীক্ষায় প্রথম চান্সেই সফল হওয়ার পেছনে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অপরিসীম।

রামজীবন হাঁসদা, Executive, WBCS-2015

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দরকার অদম্য জেদ, ধৈর্য্য, নিরবছিন্ন ভাবে পরিকল্পামাফিক পড়াশুনা আর সঙ্গে সঠিক গাইডেন্স ও পর্যাপ্ত স্টাডি মেটিরিয়াল । অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে ভর্তি হয়ে এবং এখানকার উচ্চ মানের ফ্যাকাল্টিদের গাইডেন্সে আমার লক্ষ্য পূরণ হল

ভানু কেওড়া, CTO, WBCS -2015

আমার সাফল্যের পথে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য অনস্বীকার্য। এখানকার মক ইন্টারভিউ আমাকে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সামিম সরকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহ দান আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছে। গ্রুমিং সেশন গুলো এক কথায় অভূতপূর্ব। টপ র‍্যাঙ্ক অফিসারদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

সৌগত চৌধুরী, Executive, WBCS-2015

এই সাফল্যের কারন হিসেবে রয়েছে আমার মা বাবার অফুরান সাহায্য ও উৎসাহ এবং আমার তিন হিরো-র ভূমিকা । তারা হলেন লেখক মি.বেয়ার গ্রিলস, অভিনেতা আমীর খান এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন। ধন্যবাদ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন, ধন্যবাদ সামিম স্যার। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনের ভূমিকাকে তিনটি M দিয়ে বোঝানো যায় - Mastery, Material & Motivations.

সুপ্রতীম আচার্য্য, Executive WBCS -2015

ফোন করুন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

✆ 9038786000
9674478644

Website : www.academicassociation.in ✹ Uluberia-9051392240 ✹ Barasat-9800946498
✹ Berhampur-9474582569 ✹ Birati-9674447451 ✹ Siliguri-9474764635 ✹ Medinipur Town-9474736230

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

April, 2017
R.N.I. No. 19740/69

BUY YOUR COPY NOW

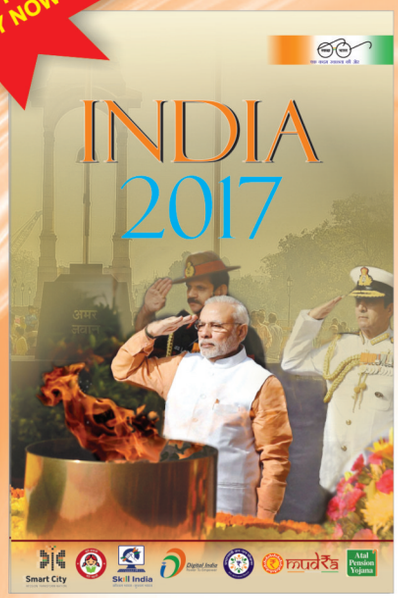

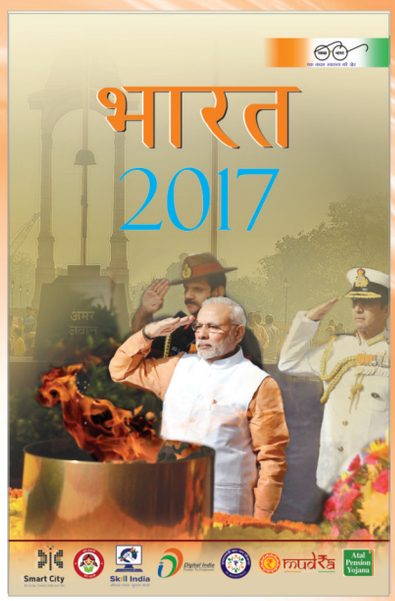

Reference Annual

A TREASURE FOR RESEARCHERS, POLICY MAKERS, ACADEMICS, MEDIA PROFESSIONALS AND JOB SEEKERS, ESPECIALLY, ASPIRANTS OF CIVIL SERVICES EXAMINATION

Also available as eBook
Buy online at-
play.google.com, amazon.in, kobo.com

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
8, Esplanade East, Kolkata - 700 069

website: www.publicationsdivision.nic.in
For placing orders, please contact:
Phone : 033-2248-6696/8030 e-mail: **kolkatase.dpd@gmail.com**
@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।